জেনারেল ওসমানী

জেনারেল ওসমানী

এম আতাউর রহমান পীর
সম্পাদিত

মদন মোহন কলেজ সাহিত্য পরিষদ, সিলেট

জেনারেল ওসমানী

এম আতাউর রহমান পীর
সম্পাদিত

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৯
ফাল্গুন ১৪১৫ বাংলা

প্রকাশনা : মদন মোহন কলেজ সাহিত্য পরিষদ, সিলেট

অক্ষরবিন্যাস : মো. শাহারুল আলম

পরিবেশনা : উৎস প্রকাশন
১২৭, আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা

মূল্য : ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ)
আইএসবিএন :

উৎসর্গ

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ ও
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে

কথামুখ

মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী—বাংলাদেশের ইতিহাসে আলোকিত এক নাম। রাজনীতি এবং সমরনীতিতে তিনি মেধা, শ্রম, দক্ষতা, সততা, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম এবং আদর্শবাদের প্রতীক। আমাদের মহান স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ওসমানী অন্যতম ব্যক্তিত্ব। এদেশের মানুষ তাঁকে 'বঙ্গবীর' অভিধায় অভিষিক্ত করেছে।

রণকৌশলী বীর সৈনিক হিসেবে ব্রিটিশ শাসনামলেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। পাক সেনাবাহিনীতে বাঙালি সৈনিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর কর্মকা ছিল আমাদের জন্য গর্বের। দুর্জয় সাহস এবং প্রখর ব্যক্তিত্বে বলীয়ান ওসমানী একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবসর জীবনের আরাম আয়েশ ত্যাগ করে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ এবং সৈনিকদের সেই গর্ব-বিশ্বাস অক্ষত রাখেন। সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য রাজনীতিতে যোগ দেন এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি হিসেবে দু-দুবার মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবার এক দলীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিবাদে মন্ত্রিত্ব ছেড়েও দেন। নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে হয়ে ওঠেন এক প্রবাদপ্রতিম পুর ষ। দেশি-বিদেশি ইতিহাসবিদ, লেখক-গবেষকদের বইপু ড়কে বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপাত সাংঘর্ষিক বিভিন্ন বক্তব্য, মন ড়ব্যও পাওয়া যায়। একটি জাতির ব্যতিক্রমী মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছেন ওসমানী। তাই তাঁর জীবন ও কর্ম আলোচনায় নানামুখি ব্যাখ্যা-বিশে- ষণের অবকাশ হয়তো আছে। কিন ড়ু একবাক্যে সবাই তাঁর সমর দক্ষতা, নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি শর্তহীন আনুগত্য, গণতন্ত্রের প্রতি নিখাদ আস্থা সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান স্বীকার করে আসছেন। স্বদেশ, স্বজাতির উন্নয়ন-সাধনে তাঁর চেতনা আমাদের যুগ যুগ ধরে উদ্দীপ্ত করবে—এই

প্রত্যাশায় মদন মোহন কলেজ সাহিত্য পরিষদ সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ-গ্রন্থেও জেনারেল ওসমানীর জীবন ও কর্মের অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন লেখকবৃন্দ। তাঁদের কাছে আমরা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ। জনাব আবদুল হামিদ মানিক ও জনাব মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান সম্পাদিত *নাম তাঁর ইতিহাস* (১৯৮৪ খ্রি.) থেকে এ-পুস্তকে কয়েকটি রচনা সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া উৎস প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী মদন মোহন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মোস্তফা সেলিমও কয়েকটি রচনা সংগ্রহে আমাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। এ সংকলনে জনাব আবদুল বাতিন ফয়সল ওসমানী জাদুঘরের কিছু রঙিন ছবি সরবরাহ করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

মহম্মদ আতাউল গণির নামের সঙ্গে ওসমানী শব্দের সংযোগ নিয়ে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এ-বিতর্ক নিরসন গবেষকদের কাজ। আমরা কেবল তথ্যের সমতা এবং প্রমিত বানান নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছি। প্রকাশনার ব্যাপারে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রজত কান্তি ভট্টাচার্য্য ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কবি আবিদ ফায়সাল বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে এই প্রকাশনাকে ত্বরান্বিত করেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত আনুকূল্য দানের জন্য তাঁদেরকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ।

এম আতাউর রহমান পীর
অধ্যক্ষ, মদন মোহন কলেজ, সিলেট

ফেব্রুয়ারি, সিলেট

সূচি

জেনারেল ওসমানীর ওসমানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম	:	সূর্যতাপস
আবদুল হান্নান চৌধুরী	:	ওসমানী : কিছু স্মৃতি
আবদুল হামিদ মানিক	:	নন্দিত জেনারেল
এ কে শেরাম	:	জেনারেল ওসমানী : তাঁর অন্তর্চেতনার অনন্য কিছু স্মৃতি
এস.এম জালালউদ্দিন	:	ওসমানী জাদুঘর
খলিলুর রহমান	:	গণতন্ত্রী ওসমানী
দেওয়ান ফরিদ গাজী	:	তাঁকে সালাম জানিয়ে আমরা গৌরববোধ করি
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	:	মরণজয়ী ওসমানী
মহিউদ্দিন শীরু	:	আমার দেখা ওসমানী
মোস্তফা শহীদ	:	জেনারেল ওসমানী : দূর থেকে দেখা
মো. আব্দুল আজিজ	:	ওসমানী, মুক্তিযুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলির পর্যালোচনা
মো. শফিকুর রহমান	:	ওসমানী বজ্রের মতো কঠোর, পুষ্পের মতো কোমল
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	:	বঙ্গবীর এম.এ.জি ওসমানীর জীবন কর্ম
রফিকুর রহমান লজু	:	বঙ্গবীর এম.এ.জি ওসমানী

জেনারেল ওসমানীর মৃত্যু পরবর্তী জাতীয় সংবাদপত্রের
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (সম্পাদকীয় নিবন্ধ) :

ফটো অ্যালবাম	:	
আবুল লেইছ শ্যামল	:	আমার ক্যামেরায় ওসমানী ও কিছু স্মৃতি

জেনারেল ওসমানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম	:	মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী
জন্ম তারিখ	:	**১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮**
জন্মস্থান	:	সুনামগঞ্জ শহর
পিতা	:	খান বাহাদুর মফিজুর রহমান তৎসময়ে সুনামগঞ্জ মহকুমা কর্মকর্তা
মাতা	:	জোবেদা খাতুন
পৈতৃক নিবাস	:	দয়ামির গ্রাম, বালাগঞ্জ, সিলেট
পিতামহ	:	আবদুস সুবহান
মাতামহ	:	বিশ্বনাথ উপজেলার জমিদার মহম্মদ আকিল চৌধুরী

শিক্ষা ও কর্মজীবন

১৯২৩ খ্রি.	:	গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু।
১৯৩৪ খ্রি.	:	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সিলেট গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস এবং ইংরেজিতে বিশেষ অবদানের জন্য 'প্রিটোরিয়া প্রাইজ' অর্জন।
১৯৩৪ খ্রি.	:	উচ্চশিক্ষার্থী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি UOTC-এর সার্জেন্ট, স্যার সৈয়দ আহমদ হলের উপদেষ্টা এবং পর পর দু'বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রক্টোরিয়াল মনিটর'-এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসাম বেঙ্গল ছাত্র সংঘের সহসভাপতি নিযুক্ত হন।
১৯৩৮ খ্রি.	:	কলা বিভাগে ডিগ্রি লাভের পর ভূগোল বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রির প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হন এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।
১৯৩৯ খ্রি.	:	জুলাই মাসে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান।
১৯৪০ খ্রি.	:	৫ অক্টোবর ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি, দেরাদূন থেকে সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে কমিশনপ্রাপ্ত হন।
১৯৪১ খ্রি.	:	ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যাপটেন হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।
১৯৪২ খ্রি.	:	ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মেজর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং একটি ব্যাটালিয়নের কমান্ডার-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

বেশিরভাগই বিভিন্ন যোদ্ধা সামরিক ফরমেশনের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র যান্ত্রিক পরিবহন বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন। তিনি বার্মা রণাঙ্গনে তাঁর বাহিনীকে ১৫ নম্বর কোরের অধীনে পরিচালনা করেন এবং তিনি একটি ফরমেশন হেড কোয়ার্টারে জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড-২ পদে নিযুক্তি লাভ করেন।

১৯৪৬ খ্রি. : ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড-কর্তৃক স্টাফ কলেজে লং কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন লাভ করেন। একইসঙ্গে তিনি আই.সি.এস পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হওয়ায় ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের জন্য মনোনয়ন লাভ করেন। তবে সৈনিকজীবনকেই তিনি বেছে নেন এবং আই.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও চাকরিতে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।

১৯৪৭ খ্রি. : ভারত বিভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সিমলাস্থ কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল শাখায় পাকিস্ড়ানের জন্য অংশ-নির্ধারণ করার দায়িত্ব পালন করেন এবং সেখানে তিনি 'পাকিস্ড়ান সেল' গঠন করে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৭ অক্টোবর পাকিস্ড়ান ফিরে আসেন ও লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে কোয়ার্টারস মাস্টার জেনারেল শাখার ফার্স্ট গ্রেড স্টাফ অফিসার হিসেবে বিভিন্ন বিভাগের কার্যনীতির সমন্বয়, পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ের গুর"দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একই বছর স্টাফ কোর্সে যোগদান করেন এবং পি.এস.সি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৪৯ খ্রি. : জানুয়ারি মাসে সেনাবাহিনীর চিফ অভ দি জেনারেল স্টাফ-এর জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড-১ এর সহকারী নিযুক্ত হন।

১৯৫১-১৯৫৩ : তিনি খুলনা, যশোর, ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্টেশন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৫ খ্রি. : তদানীন্ড়ন পূর্ব পাকিস্ড়ান রাইফেলস-এর অতিরিক্ত কমান্ড্যান্ট-এর দায়িত্ব পালন করেন এবং এ-সময় তিনি ই.পি.আর এ অবাঙালি নিয়োগ বন্ধ করে উপজাতীয়দের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

১৯৫৬ খ্রি.	:	আর্মি হেড কোয়ার্টারস এর জেনারেল স্টাফ-এ তিনি ডিপুটি ডাইরেক্টর, মিলিটারি অপারেশন এর দায়িত্ব লাভ করেন এবং কর্নেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন।
১৯৬৪ খ্রি.	:	আধুনিক সামরিক ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি অনুধাবন ও মূল্যায়ন করার জন্য সরকার-কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়।
১৯৬৫ খ্রি.	:	সেপ্টেম্বরের পাক-ভারত যুদ্ধে ডিপুটি ডাইরেক্টর অভ মিলিটারি অপারেশন-এর দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৬৬ খ্রি.	:	১৬ মে অবসর প্রাক্কালীন ছুটি ভোগ শুর্ করেন।
১৯৬৭ খ্রি.	:	১৬ ফেব্র্য়ারি অবসরগ্রহণ করেন।
১৯৭০ খ্রি.	:	জুলাই মাসে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও বিশ্বনাথ এ-চার থানা নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করেন।
১৯৭১ খ্রি.	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ১২ এপ্রিল থেকে তিনি মন্ত্রীর সমমর্যাদাসহ বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন।
১৯৭২ খ্রি.	:	বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেন এবং গণপরিষদের সদস্যরূপে শপথ গ্রহণ করেন। ১২ এপ্রিল জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশ সরকারের জাহাজ চলাচল, অভ্যন্ড়রীণ নৌ ও বিমানমন্ত্রী হিসেবে কেবিনেটের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
১৯৭৩ খ্রি.	:	৭ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি বালাগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ-এ দুটি থানা নিয়ে গঠিত নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন এবং মন্ত্রিপরিষদে আগেকার মন্ত্রণালয়ের ভার ছাড়াও তিনি ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।
১৯৭৪ খ্রি.	:	মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।
১৯৭৫ খ্রি.	:	জানুয়ারি মাসে সংসদীয় গণতন্ত্র বিলুপ্ত ও একদলীয় শাসন সংক্রান্ড় শাসনতন্ত্রের সংশোধনীর বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় সংসদ উভয়েরই সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৭৬ খ্রি. : ৫ সেপ্টেম্বর নতুন রাজনৈতিক দল 'জাতীয় জনতা পার্টি' গঠন করেন।

১৯৭৮ খ্রি. : বাংলাদেশের বিরোধীদল-কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৮৪ খ্রি. : ১৬ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের সেন্টপল হাসপাতালে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় মৃত্যুবরণ করেন।

সেনাবাহিনীতে অবদান

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাকালে বহু বাধাবিঘ্নের মোকাবিলায় নিঃস্বার্থ ও নিবেদিত প্রাণ ওসমানী নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পন্ন করেন:

বাঙালি দ্বারা গঠিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐতিহ্য এবং রেজিমেন্টের সর্বশ্রেণীর অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সম্মিলিত জীবনীশক্তি গঠন, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে মাত্র দুটি ব্যাটালিয়ন থেকে ছয়টি ব্যাটালিয়নে উন্নীতকরণ এবং সেনাবাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা শতকরা ২ থেকে শতকরা ১০ ভাগে উন্নীতকরণ এবং বাঙালিদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যানুপাতে জুনিয়র কমিশন অফিসার পদসহ সর্বস্তরের বাঙালি সৈনিকদের জন্য পদ সংরক্ষণ, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত বাংলা মার্চ সংগীত 'চল চল চল'-কে পাকিস্তান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মার্চ সংগীতরূপে সরকারি অনুমোদন, এছাড়া পাকিস্তানের সামরিক বাদ্যযন্ত্রে সরকারিভাবে 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' ও 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ'সহ বাংলা গানের প্রচলন এবং ব্রতচারী নৃত্যের পাকিস্তানে পুনর্জীবন এবং ব্রতচারী নৃত্যের বাংলা গীতি ও বাদ্যযন্ত্রসহ বাঙালি সৈনিক দ্বারা ব্রতচারী নৃত্য পরিবেশনের সরকারি অনুমোদন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদায় গ্রহণের সময় ওসমানী পাকিস্তানে বাঙালি সামরিক বাহিনী ও তাদের পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা ও এসবের সমাধানের জন্য লিপিবদ্ধ সুপারিশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তদানীন্তন সর্বাধিনায়ক জেনারেল এ.এস. ইয়াহিয়া খানকে দিয়ে আসেন। এতে স্বল্প সময়ে পাকিস্তানে লোকসংখ্যা অনুপাতে বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনাও তিনি সশস্ত্রবাহিনীর প্রবীণ বাঙালি অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিনকে দেন, যাতে তিনি বিষয়গুলো সম্বন্ধে তাগিদ দিতে পারেন। পরবর্তীকালে প্রাথমিক পদক্ষেপস্বরূপ জেনারেল ইয়াহিয়া-কর্তৃক সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা শতকরা ১০০ ভাগ বাড়ানোর নির্দেশ প্রদান করেন।

সংকলনে : এম আতাউর রহমান পীর

সূর্যতাপস
আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম

'বঙ্গবীর ওসমানী' শুধু একটি নাম নয়। বাঙালি জাতির সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের অখণ্ড ইতিহাস। গণতন্ত্রের নামে অর্জিত পাকিস্তান রাষ্ট্র গণতন্ত্রকে পাকাপোক্ত কবর দিলো এবং সে কাজটায় নেতৃত্ব দিলেন পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বয়ং। তীক্ষ্ণধী রাজনীতিবিদ জনাব জিন্নার রাজনৈতিক জীবনে সেটা চরম ট্র্যাজেডি। চূড়ান্ত পরাজয় এবং এই সুযোগে পাকিস্তানি রাজনীতিতে তাঁরই আমদানিকৃত আমলাগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের কালোহাত বাড়িয়ে দিলো সামরিক-জান্তার দিকে। প্রকাশ্য জনসভায় নিহত হলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। অবশ্য এ-ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আমলাগোষ্ঠীর মুখপাত্র গোলাম মোহাম্মদের মৃত্যু হয়েছিল উন্মাদরূপে এবং কার্যোদ্ধার শেষে ষড়যন্ত্রের শিখণ্ডী ইসকন্দর মির্জার নির্বাসন ঘটলো সাগরপারের দেশে এবং ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক আইয়ুব খান ক্ষমতায় এলেন।

আইয়ুব খান নির্লজ্জের মতো নিজের নামের আগে ফিল্ড মার্শাল খেতাবটি লাগিয়ে, বুকে তারই পরিচয়সূচক মেডেল এঁটে, লৌহমানব বলে নিজেকে জাহির করার অপর্যাপ্ত চেষ্টা করেও কিন্তু ক্ষমতায় কায়েমি হয়ে থাকতে সক্ষম হলেন না। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিলো। তাঁরই বিকলাঙ্গ মানস-সন্তান মৌলিক গণতন্ত্র নামক আজব বস্তুটা ক্ষমতার মঞ্চ থেকে তাঁর অপসারণ ত্বরান্বিত করলো। এদিকে ততোদিনে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির চেহারা ছবি। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন আদৌ স্বাধীন হন নি। পাকিস্তান নামের তথাকথিত স্বাধীনতা আসলে শোষকদের হাতবদল মাত্র। শ্বেত পরাশক্তির কবল থেকে মুক্তিলাভের নামে আরেক পরাশক্তির কবজায় তাঁরা বন্দি হয়েছেন স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে। এখন ওদেরই হাতে অসহায়ের শিকার।

বৃহৎ জনগোষ্ঠী আরও উপলব্ধি করলো তাঁরা কখনো পাকিস্তানি বনতে পারবে না। কারণ তাঁদের পায়ের নখ থেকে আরম্ভ করে মাথার চুলগুলো পর্যন্ত যে বাঙালি এবং মুসলমান এই সত্যটাকে কখনো ভুলতে পারবে না পশ্চিম পাকিস্তানের বাসিন্দাগণ। ওঁদের (মরহুম) পূর্বপুরুষগণই তো এই উপমহাদেশে শ্বেত পরাশক্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বনেছিলেন ওদের দেহরক্ষী। কিন্তু এঁদের শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষগণ ভুকা ফাঁকা থেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন তথাপি পরাশক্তির জি-হুজুর খাদেম বনতে পারেন নি। এটা কিন্তু মস্ত ফারাক। চারিত্রিক পার্থক্য। আর শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষদের সেই যন্ত্রণা-বিজয়ী প্রজ্ঞার

উত্তরাধিকারী এঁরা। কাজেই ওঁদের সাথে এঁদের একত্রে বসবাস করাটা সম্ভবপর নয়।

আমাদের বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনটা সাংস্কৃতিক-আন্দোলনের চেহারায় আরম্ভ হলেও কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনায় সামগ্রিকভাবেই উদ্বুদ্ধ করেছিলো আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে। দেশের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি তখন আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানি আমল জঙ্গি-শাসকগোষ্ঠীর অহেতুক জুলুম অবিচার ততোদিনে প্রতিষ্ঠানটিকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তার ঘোষিত ৬ দফাকে বৃহৎ জনগোষ্ঠী নিজেদের মুক্তিসনদ বলে গ্রহণ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে হেন অঞ্চল নেই যেখানে আওয়ামী লীগ ও তার নেতা শেখ মুজিবুরের নাম পৌঁছে নি—শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয় নি। কর্নেল ওসমানী তখন সামরিক বাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেছেন। দেশের বিদগ্ধ মহলে জনাব ওসমানী একটি সুপরিচিত নাম। কিন্তু শেখ মুজিবের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে যখন আওয়ামী লীগে যোগদান করে সরাসরি রাজনীতিতে নামলেন তখন যেন ঝড়ের বেগে তাঁর নামটিও ছড়িয়ে পড়লো দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। তাঁরা জানতে পারলেন এখন আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের নামটির সাথে যুক্ত হলো আরেকটি নাম যিনি অনন্যসুলভ ব্যক্তিত্ব এবং অকপটচিত্ত। রাজনীতির নামে তথাকথিত কূটকৌশল কিংবা ধোঁকাবাজি ঘৃণা করেন মনেপ্রাণে। কথায়-কাজে, নীতি আদর্শে কোনো অস্পষ্টতা তাঁর নেই। নেই কোনো ফারাক। ওদিকে লৌহমানব আইয়ুব খান তখন পর্দার অন্তরালে চলে গিয়েছেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান এসেছেন ক্ষমতায় এবং ক্ষমতা গ্রহণ করে জনপ্রিয়তা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় ঘোষণা করলেন সাধারণ নির্বাচনের কথা। অবশ্য তার সাথে জুড়ে দিলেন কোনো উর্বর মস্তিষ্ক-কর্তৃক আবিষ্কৃত ফ্রেম ওয়ার্ক নামক কিছু কু-শর্ত। কিন্তু আওয়ামী লীগ সেটা মেনে নিল।

জনাব ওসমানীর আওয়ামী লীগে যোগদানটায় একটা আকস্মিক নাড়া খেলো পাকিস্তানি সামরিক-জান্তা। কিন্তু দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী আশ্বস্ত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যয় জেগেছে এবার অধিকারহীন স্বাধীনতার নরক যন্ত্রণা থেকে উত্তরণ অবশ্যই হবে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। বিয়ানীবাজার থানা-কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের জনসভা। কথা ছিলো ওসমানী সাহেব আসবেন। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত আসতে পারেন নি। পাঠিয়েছেন জেনারেল মজিদকে।

বিকাল বেলা। পশ্চিমাকাশের দিকে হেলে পড়েছে সূর্যটা। জনসভা শেষে জনাব মজিদকে বিদায় দিয়ে বাড়ি ফিরছি। মনে খুশির আমেজ। লোকারণ্যে পরিণত হয়েছিল সভাটা। খুব খুশি হয়েছেন জেনারেল মজিদ। আসামের সুপরিচিত মজিদ পরিবারের যোগ্য সন্তান এবং (মরহুম) শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভায়রাভাই মেজর

জেনারেল এম আই মজিদ। তাঁকে ডিঙিয়ে জুনিয়র আইয়ুব খানকেই পাকিস্ড়ানের সি.ইন.সি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী (মরহুম) লিয়াকত আলী খান।

অহমিয়া ও সিলেটি আঞ্চলিক ভাষা মিলিয়ে চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছেন জেনারেল মজিদ। বলেছেন, খামকা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মানুষের মতো বাঁচতে হলে অধিকারহীন এই স্বাধীনতাকে গোর দিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। আর তাতে আমরা কামিয়াব হবো ইনশাল- াহ।

তাঁর প্রত্যয় দৃঢ় বক্তৃতা জনমনে আস্থা দৃঢ়তর করেছে। মুহুর্মুহু আনন্দধ্বনি উঠেছিলো। আমার আগে আগে চলেছেন দলে দলে মানুষ। তাঁরা জনসভায় এসেছিলেন। হঠাৎ একটা কথা কানে পৌঁছলো। কৌতূহল লাগলো মনে। চলার গতিটা কমিয়ে দিলাম। একটু আড়ালে থেকে শুনতে চাইলাম জনগণের বক্তব্য। জানতে চাইলাম আওয়ামী লীগ সম্বন্ধে ওঁদের মনের গোপন কথাগুলো। আজকের সভার সাফল্য সম্পর্কে ওঁদের মতামত।

শুনি একজন বলছে, 'খুউব সুন্দর মিটিং অইছে। খালি মানুষ আর মানুষ। অতো মানুষ আর কোনো মিটিংয়ে দেখছি না।'

'ঠিক কথা! অন্যজন সাপোর্ট দিলো। 'চমৎকার বক্তৃতাও দিছইন, জেনারেল মজিদ সাব। কিন্ডুক আমরার কর্নেল ওসমানী সাব মিটিংয়ে আইলা না কেনে?'

'অয়! কেনে আইলা না?'

প্রশ্ন উঠলো জনাব ওসমানী মিটিংয়ে কেন এলেন না। সভায় অবশ্য আমরা তাঁর অনুপস্থিতির কারণটা নিবেদন করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি তাতে জনগণ সন্ডুষ্ট হয় নি। মনের কোণে নিজের অযোগ্যতার প্রশ্ন জাগলো। কৈফিয়তটা সঠিকভাবে পেশ করতে পারি নি নিশ্চয়ই।

এখন ওঁদের কেউ আর কোনো কথা বলছে না। কেমন চুপচাপ সবাই হেঁটে চলেছে। আমি ভাবছি মূক হয়ে গেলো নাকি লোকগুলো। কারণ আমি এখনো তো কিছুটা তৃপ্তি আর কিছুটা অতৃপ্তির দ্বন্দ্বে ভুগছি। থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কর্নেল ওসমানী সাহেবের অনুপস্থিতির কৈফিয়তটা সঠিকভাবে পেশ করতে পারি নি। ছি, ছি!

অগত্যা একশলা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করি। টানি, ধুঁয়া ছাড়ি। একটা আলে ঠোকর খাই। নিজের অযোগ্যতা আমাকে দংশন করছে। এমন সময় হঠাৎ শুনি 'আসল কথাটা কইতামনি?'

পর মুহূর্তে একসাথে সবাই সায় দিলো : 'কইন সাব, কইন?'

দুর ু দুর ু করে উঠলো আমার বুকখানা। কণ্ঠস্বরটা জনৈক প্রবীণ ব্যক্তির। লোকটি প্রভাবশালী এবং আওয়ামী লীগের উলটা। মনে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলো। নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের বির ুদ্ধে কিছু শুনতে হবে এবং মনের এই কর ুণ

অবস্থায়ই শুনতে পেলাম : হু! আগে আওয়ামী লীগের মাত্র একজন লিডার আছিলা শেখ মুজিব। কিন্ডুক একা কোনো কাজই সঠিকভাবে করা যায় না। তারোপরে শেখ সাহেব লড়াইর ব্যাপারে বেশি কিছু জানোইন না। এখন লড়াইর ভারটা পুরাপুরি ওসমানী সাবের ওপরে। তাই হক্কল মিটিংয়ে আইতা পারোইন না। টাইম পাইন না।

একজন তর"ণ জিজ্ঞাসা করলো, 'হাচায়ু লড়াই অইবোনি?'

মনে হলো আরও অনেকের সাথে এ প্রশ্নটা আমারও। জবাবে প্রবীণ ব্যক্তিটি বলেন, 'লড়াই ছাড়া দোসররার পথ নাই, কারণ, ওই পাকিস্ড়ানিরা আসলে মানুষ না। তাই আমরারেও মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেয় না, গণ্য করে না।' কথাগুলো বলে প্রশ্ন করলেন, 'কোন দেশে হুনছো সরকার ছাত্র খুন করে? আফ্রিকার জংগলিরাও অমন কুকাজ করে না। করতে পারে না। ছাত্র সমাজরে দুনিয়ার হক্কলে মায়া মহব্বত করে।'

একটুখানি থামলো।

অতঃপর বললো, 'এইবার কিন্ডুক টের পাইবা। আর তা না অইলে আমরার বাঁচবার কোনো উপায় নাই। আল- াহ ওসমানী সাবের হায়াত দরাজ করউকা। তৌফিক দেউকা।'

ওর কথাগুলো আমাকে ভাবিয়ে তুলল। আমি আরেকটুকু পেছনের দিকে তাকাই। পাকিস্ড়ান আন্দোলনের শুর"তে কলকাতার জনৈক শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞব্যক্তি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন "তোমাদের 'লড়কে লেংগে' এই আরম্ভ হলো। সমাপ্তিটা ঘটবে কিন্ডু দীর্ঘদিন পরে, প্রচুর রক্তপাতের মাধ্যমে।"

তিনি ছিলেন ধর্মে খ্রিস্টান। রাজনীতিতে কংগ্রেসের সাপোর্টার। আমি ভাবলাম হিংসা। তিনি টের পেলেন আমার মনোভাবটা। মৃদু হেসে বললেন, 'অমন সংকীর্ণমনা হওয়াটা ভালো না। আমি হিংসুটে নই। সময় এলে দেখবে তখন।'

এখন সহসাই মনে পড়লো ওঁর কথাগুলো। সত্যিই তো আমরা এখন নিজেদের ভুলগুলো দেখতে পাচ্ছি। কিন্ডু সংশোধনের উপায়টা কী? দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ন্যায্য দাবিদাওয়াগুলো কখনো অগ্রাহ্য করতে পারে না কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্ডু আমাদের সমস্যা শুধু সেটাই নয়। সংখ্যাগুর"দের দাবিদাওয়া শুধু অগ্রাহ্যই নয়, বন্দুকধারী ওই সংখ্যালঘুরা দেশটিকে ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের দিকে।

শরীরটা শিউরে উঠলো। সিগারেটটা খসে পড়লো হাত থেকে।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে জনাব ওসমানী পাকিস্ড়ান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সততা, গণতন্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বস্ড়তা এবং রাষ্ট্র নায়কোচিত প্রজ্ঞা শুধু আওয়ামী লীগের কর্মী মহলেরই নয়,

দেশের জনগণের আত্মপ্রত্যয়কেও দৃঢ়তর করে তুলল। সৈনিকজীবনের শেষে তাঁর রাজনীতিতে সঠিক পদ্ধতিতে আগমন। কাজেই খাঁটি সৈনিকোচিত নিয়মানুবর্তিতা এবং দার্ঢ্য তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিলো। জাতির চরম দুর্দিনকালে সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, নৈরাশ্য থেকে উত্তরণে জাতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলো ওই দুর্লভ গুণাবলি।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ যখন জনগণকে প্রদত্ত ওয়াদা থেকে সরে গেলো, নিজেদের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিলো, বিলুপ্তি ঘটলো জাতির আকাঙ্ক্ষিত সংসদীয় গণতন্ত্রের, কায়েম হতে চললো একদলীয় স্বৈরশাসন পদ্ধতি, সেই দুঃসময়ে এই নির্ভীক সেনানী সেই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনটাকে মেনে নেন নি। ক্ষমতার প্রতি মোহ তাঁর কখনো ছিলো না। অতি সহজে বঙ্গবন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমরা আইয়ুব খানকে দেখেছি, ইয়াহিয়া খানকেও দেখেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কিন্তু মুজিব খান রূপে দেখতে চাইনে।'

সেকালে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অমন স্পষ্টভাষী মাত্র একজন লোকই ছিলেন যাঁর নাম বঙ্গবীর ওসমানী। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক।

আমার মনে একটা খটকা রয়েছে। যার সঠিক জবাবটা এখনো পাই নি। বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি চুপ করে রয়েছিলেন। কারণ ঘটনাটা যখন ঘটে তখন তিনি বর্বর কসাই ইয়াহিয়া খানের জেলখানায় বন্দি। জানতেও পারেন নি বাংলাদেশটি প্রার্থিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে বলে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম স্বয়ং বঙ্গবীরকে। তাঁকে একান্তেই কিছু জিজ্ঞাসা করলেই আমাকে 'বেয়াড়া' বলে সম্বোধন করতেন। মৃদু হেসে প্রথমদিন বলেছিলেন কবি-সাহিত্যিক-লেখক নাকি 'বেয়াড়া' অর্থাৎ দুঃসাহসী হয়ে থাকে। আমি বললাম, 'বেয়াড়া' শব্দটার বিশ্রি অর্থও আছে'। জবাবে বললেন—'সিলেটি অর্থ মাত্র একটাই।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা অইলেও সৈনিকদের মতন 'বেয়াড়া' কি?'

জবাবে তাঁর গোঁফের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠলো চমৎকার হাসির একটা টুকরো।

সেবার দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সাথে সিলেটে এসেছেন দেশের অন্যতম মন্ত্রী বঙ্গবীর ওসমানী। নিবাস সার্কিট হাউসে। বাথরুম থেকে মুখহাত ধুইয়ে তোয়ালে হাতে বেরিয়ে এলেন। খানা খেতে যাবেন পাশের রুমে। বঙ্গবন্ধুও তৈরি হচ্ছেন খানার টেবিলে বসার জন্যে।

বঙ্গবীর বললেন, 'বও।' এবং তখনই আমি পেশ করলাম প্রশ্নটা।

হানাদার বাহিনী ঢাকায় যখন আত্মসমর্পণ করেছিলো—আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক সেখানে গরহাজির ছিলেন কেন? অথচ ঘোষণা করা হলো মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত কমান্ডের হাতেই ওরা সারেন্ডার করেছে।

কয়েকটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন বঙ্গবীর। চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি। কিন্ডু গোঁফের মধ্যে হাসির ঝিলিক জাগলো। আজ কিন্ডু 'বেয়াড়া' বললেন না। বললেন—'আত্মজীবনী লেখমু জবাব পাইবায়।'

স্বাধীনতা অর্জনের পরে দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু যখন দেশের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে করা হয়েছিলো প্রতিরক্ষা দপ্তরটা ওসমানী সাহেবকে দেওয়া হবে এবং সেটাই হতো সংগত, সঠিক। কিন্ডু বাস্ড়বে অন্যথা ঘটলো।

এই প্রশ্নটার জবাবে বঙ্গবন্ধুর হাতের একটা থাপপড় পড়েছিলো আমার পিঠে। অবশ্য বঙ্গবীরকে প্রশ্ন কখনো করি নি। এখন কিন্ডু মনে হয় প্রতিরক্ষা দপ্তরটা বঙ্গবীরের হাতে থাকলে হয়তো অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক বৈপরীতের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে দেশটি অমন নাকানো চুবানো খেতো না। আর দেশবাসী বনতোনা অমন যন্ত্রণার শিকার।

আমাদের জাতীয় জীবনে বঙ্গবীর মধ্যদিনের সূর্যতাপসের মতো। যখন দেশে সত্যিকারের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে, অধিকারহীন স্বাধীনতার নৈরাশ্য থেকে উত্তরণ ঘটবে এবং তাঁর জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হবে সর্বত্র, ঠিক তখনই তাঁর প্রতি প্রদর্শিত হবে সঠিক সম্মান, সঠিক শ্রদ্ধা। সেই অনাগত দিনগুলো নিশ্চয় এগিয়ে আসছে।

সূত্র : নাম তাঁর ইতিহাস

আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম (১৯২২-২০০০) : কথাসাহিত্যিক

ওসমানী : কিছু স্মৃতি
আবদুল হান্নান চৌধুরী

বঙ্গবীর ওসমানীকে যেমন দেখেছি, সে সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। আমি লেখক নই, লেখার অভ্যাস আমার নেই। আবার অনুরোধ উপেক্ষা করার সাহসও পাই না। তাই এ-প্রয়াস।

ভাবছি, বঙ্গবীরের স্মৃতি কোথা থেকে শুর" করি। যেখান থেকেই শুর" করি না কেন, তাঁর জীবনে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সময়জ্ঞান ও কথার দাম সব ধাপেই সমভাবে লক্ষণীয়। এই গুণ তাঁর চরিত্রে আজীবন অতি উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান ছিল। বঙ্গবীরের জীবন অত্যন্ড় ব্যাপক এবং কর্মময়। নির্দিষ্ট কোন অধ্যায় থেকে শুর" না-করে আমি তাঁর জীবনের বিচ্ছিন্ন দুচারটি ঘটনা পাঠকদের সামনে নিবেদন করছি।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের উদ্দেশে যাই। পৌঁছার সাথে সাথে দেখলাম সেখানে তৎকালীন ভারতবর্ষের সব প্রদেশের ছাত্রছাত্রীর সাথে বাইরের ছাত্রও রয়েছেন। চতুর্থ দিনে এডমিশন নেওয়ার সময় স্যার সৈয়দ হলের প্রভোস্ট সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, Which part of India you come from? উত্তর দিলাম—আসাম। সাথে সাথে তিনি বললেন, 'Then I have no problem. You must have sense of discipline and duty like Ataul Goni Osmany, surely you know him.'

Thank you sir বলে বাইরে আসতে আসতে আমি ভাবলাম, প্রভোস্ট সাহেব কোন ছেলের কথা বললেন। দেওয়ান তালিবুর রাজা তখন আলীগড়ের সিনিয়র ছাত্র। তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমরা আসামের ছাত্ররা ওসমানীকে নিয়ে গর্ব করি। আপনি তাঁকে দেখেন নি? তিনি বর্তমানে King's Commission পেয়ে আর্মিতে আছেন।'

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ইউ.ও.টি.সি-র উইন্টার কেম্পিং-এর জন্যে দেরাদুন যাই। রেলওয়েস্টেশনে ওসমানী সাহেবের সাথে দেখা। নবীন আর্মি অফিসার। হাতে ছোট বেটন। আমার পরিচয় দিতেই তিনি আমাকে বললেন, 'চলুন রিফ্রেশমেন্ট র"মে। কিছু খাবো এবং গল্প করবো।'

তাঁর কথার মধ্যে এমন মায়াভরা আদেশের সুর ছিল যাতে আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর পেছনে পেছনে রিফ্রেশমেন্ট র"মে ঢুকে পড়ি। নানা কথার পর প্রশ্ন রাখলেন, আপনি আলীগড়ে Extra curriculum activities-এর কোন সংস্থার সাথে জড়িত? উত্তর দিলাম—U.O.T.C; I.A.T,C, Pre-Cadet, Games and National Guard. শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'আলীগড়ে পৃথিবীর নানা দেশ

থেকে ছাত্র আসে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের জন্য নয় এবং নিজেকে Practical মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং যতদূর সম্ভব নিজের যতটুকু আছে তার প্রকৃত পরিস্ফুটন ঘটানোর জন্য।' বারবার বললেন, 'আমরা কিন্তু শুধু ছাত্র হিসাবে এখানে আসি না, আমরা আমাদের অঞ্চলের এক একজন দূত।'

সেদিন আরও অনেক কথার পর বিদায় নিলাম। তখন মনে পড়লো প্রভোস্ট সাহেবের সাথে প্রথম সাক্ষাতের কথা; সেই সাথে ওসমানী সম্বন্ধে তালেবুর রাজা সাহেবের মন্তব্যের সার্থকতা উপলব্ধি করলাম।

তারপর ওসমানী সাহেবের সাথে আর দেখা হয় নি। লেখাপড়া শেষ করার সাথে সাথে কর্মজীবন শুরু হয়ে যায়।

১৭ জুলাই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। বেলা প্রায় ৯টা। আমি মালদহে। কর্নেল সেন ও মেজর ত্রিবেদী জিপ নিয়ে এলেন এবং আমাকে বললেন, 'এখনই চলুন। কালুরঘাট যেতে হবে। আপনাদের সি.এন.সি আজ দুপুরে আসছেন।'

সাথে সাথে জিপে আরোহণ করি এবং কালুরঘাটের উদ্দেশে রওয়ানা দিই। পথে মনে মনে ওসমানীর স্মৃতিচারণ করছি। সেই ১৯৪৪-এর পর আর তাঁকে দেখি নি। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আমি যখন দিনাজপুর তখন তাঁর রাজনীতিতে যোগদান এবং ইলেকশনে জয়লাভ সম্পর্কে জানতে পারি। আবার ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। এসব ভাবছি আর কর্নেল সেন ও মেজর ত্রিবেদীর মুখে ওসমানী সম্পর্কে নানান গল্প শুনছি।

বেলা ১২টায় পৌঁছলাম কালুরঘাট। আরও ৩০ মিনিট পর ওসমানী সাহেব পৌঁছেছেন। হেলিকপটার পৌঁছার সাথে সাথে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্যে এগিয়ে গেলাম। খুব সাধারণ বেশে বেটন হাতে ওসমানী সাহেব নামলেন। তাঁর ধীর পদক্ষেপ এবং চাহনিতে আমি যেন কিছু খুঁজতে চেষ্টা করি। পরিচয় দিলাম এবং ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের দেরাদুনের কথা স্মরণ করাতে চেষ্টা করলাম। একটু নীরব থেকে বললেন, 'আমি নিজেই সে খবর নিয়েছি। যখন শুনলাম অমুক নামের একটি লোক সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিচ্ছে, তখন আমি নিজেই জানতে চাইলাম এই কি সেই লোক যার সাথে প্রায় তিন যুগ আগে দেরাদুনে দেখা হয়েছিল। আপনার কথা ইতোমধ্যে অনেকের কাছেই শুনেছি এবং আমি নিজেই গর্বিত।' এরপর অনেক কথা হয়। কালুরঘাটের কাজ শেষে তিনি ফিরে গেলেন। বিকেলের দিকে আমরাও ফিরে এলাম। পথে শুধু ভাবলাম, লোকটির এত দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং ধৈর্যের মনোভাব কোথা থেকে এলো। নীতিতে অটল এবং সব সময় স্বার্থের উর্ধ্বে এমন ক'জন লোকের সন্ধান বাংলাদেশে পাবো।

সূত্র : নাম তাঁর ইতিহাস

আবদুল হান্নান চৌধুরী (১৯২০-২০০০) : অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ

নন্দিত জেনারেল
আবদুল হামিদ মানিক

মুক্তিযুদ্ধের দুঃসহ দিনগুলোতে আলোড়িত হয় নি এমন পাথরপ্রাণ মানুষ বাংলাদেশে পাওয়া যাবে না। চারদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা। ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা। মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অগণিত মানুষ। শুধু হৃদয়ের গভীরে আশার একটি ক্ষীণ দীপ টিমটিম করে জ্বলছে। আশা—একদিন এ-কালরাত্রির অবসান ঘটবে। জীবন-মৃত্যুর আশা-নিরাশায় কম্পিত লাখো মানুষের মনে এবং মুখে একটি মর্মভেদী জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা—দেশ কি সত্যিই স্বাধীন হবে? যার ডাকে গণজোয়ার এসেছে তিনি বন্দি—বেঁচে আছেন কি নেই। এমনই দুঃসময়ে হতাশার অন্ধকার চিরে নক্ষত্রের মতো যে নামটি হৃদয়ে ছড়িয়েছে জীবনের আলো—সে নাম ওসমানীর। রণকুশলী কর্নেলের খ্যাতি ছিল তখন আশার আলোক। এভাবে এক নিরন্ধ্র অন্ধকারে সবার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রত্যাশার সাথে মিশে গিয়ে ওসমানী লাভ করলেন মরণজয়ীর অম- ান আসন। মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ময়দানে সশস্ত্র কারিগর হিসেবে রূপকথার নায়কের মতো ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলেন তিনি। ওসমানীর যাত্রা সেখানেই শেষ হলো না। স্বাধীনতা-উত্তর দেশে এমন স্পষ্ট এবং সাহসী ভূমিকা নিলেন যাতে তাঁর নাম এক প্রবাদিক তাৎপর্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ওসমানী এখন শুধু মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক নন। পাশে থেকে যারা তাঁকে দেখেন নি তাদের অন্তরেও ওসমানী এক স্বতন্ত্র মহিমায় অধিষ্ঠিত। তাঁর নিটোল নিষ্কলুষ ভাবমূর্তি দলমতনির্বিশেষে সর্বত্র সমাদৃত।

বঙ্গবীর ওসমানীর চরিত্রে ঘটেছিল অনেক গুণের বিরল সমাহার। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। উচ্চতর শিক্ষা শেষ করে আই.সি.এস পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন তিনি। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একটি চাকরি তখন লোভনীয় ছিল সবার কাছেই। কিন্তু ওসমানী ছিলেন ব্যতিক্রমী মানুষ। তিনি যোগ দিলেন সেনাবাহিনীতে। নিরাপদ চাকরির বদলে ঝুঁকিবহুল সৈনিকজীবনকে দিলেন অগ্রাধিকার। প্রচ- মনোবল, দুর্জয় সাহস এবং প্রখর ব্যক্তিত্বে বলীয়ান ছিলেন তিনি। সেনাবাহিনীতে রিক্রুটমেন্টের সময় তাঁকে নাকি বলা হয়েছিল–You are too short. তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, But I am taller than Nepoleon Bonaparte. ওসমানীর সেই মনোবল অবশেষে সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি আদায় করেছে।

বীর এবং রণনিপুণ হিসেবে সেই পাকিস্তানি যুগেও তাঁর খ্যাতি ছিল মুখে মুখে। তৎকালীন সেনাবাহিনীতে বাংলাভাষীদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো। ওসমানী

ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর মেধা, ব্যক্তিত্ব এবং দক্ষতা দিয়ে তিনি বাঙালি সৈনিকদের ওপর আরোপিত মিথ্যা অবজ্ঞার এক জ্বলন্ড় প্রতিবাদরূপে ছিলেন সক্রিয়। পাক সেনাবাহিনীতে তাঁর ভূমিকা বাঙালি সৈনিকদের জন্য ছিল গর্বের। দেশে তাই বীর ওসমানীর এক আসন তখনই নির্মিত হয়ে যায়।

বীরত্বের চরম প্রমাণ রাখলেন তিনি একাত্তরে। অবসর জীবনের আয়েশ জলাঞ্জলি দিয়ে ওসমানী ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধের ময়দানে। যুদ্ধের বাজনায় বীরের রক্ত চঞ্চল না হয়ে পারে! মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী তাই এ-দেশের গণমানসে বঙ্গবীরের ভাবমূর্তি অর্জন করলেন। লাভ করলেন অমরতা।

বঙ্গবীর ছিলেন আইন-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত নিয়মানুবর্তী, সময়নিষ্ঠ এবং সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ড়। এসব বিশেষণ এত লাগসইভাবে বোধ করি লক্ষজনে একজনের ওপরও প্রয়োগ করা যায় না—যেমনটি নির্দ্বিধায় করা যায় ওসমানীর ওপর। শুধু ক্যান্টনমেন্টের ছকবাঁধা জীবনেই ওসমানী অমন টিপটপ জীবনের পূজারি ছিলেন না। বরং বাইরে রাজনীতির অঙ্গনে এসেও তিনি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার এক নজিরবিহীন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের রাজনীতির অঙ্গনে প্রচলিত অনেক ঢিলেমির সাথে ছিল তাঁর প্রচ- বিরোধ। সাধারণত আমাদের তিনটার সভা শুর- হয় চারটায়। নেতার জন্যে শিথিল হয়ে যায় অনেক নিয়মকানুন। ওসমানী এক্ষেত্রে ছিলেন আপসহীন। যথাসময়ে সভার আয়োজন সম্পন্ন হয় নি। অতএব দেখা গেছে বক্তৃতা না দিয়েই ওসমানী সভাস্থল ত্যাগ করেছেন। সেবার সদ্য মন্ত্রিত্ব ছেড়ে এসেছেন সিলেটে। মাধবপুরের একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ওসমানী উপস্থিত। আগেই উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন ঠিক ছ'টায় সভার কাজ শেষ হবে। অনুষ্ঠানে যেমনটি হয়, বক্তারা একের পর এক বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। অবশেষে প্রধান অতিথির নাম ঘোষিত হলো। দাঁড়িয়েই ওসমানী বললেন, 'ছয়টা বাজার আর দুমিনিট বাকি। এক মিনিট সভাপতির এবং আমি এক মিনিট বলবো।' বলা বাহুল্য ওসমানী ঠিক ছ'টাতেই গাড়িতে উঠে বসেছিলেন।

বড়লেখায় জনসভার আয়োজন ছিল। পথে বিয়ানীবাজারে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ। সাথি এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অনুরোধ করলেন, দুচার মিনিট বক্তব্য রাখার। ওসমানীর উত্তর 'নো', কোনো পথসভাতে বক্তৃতার সময় তো আগে রাখা হয় নি।

দলের প্রচার এবং যে কোনভাবে অপরের দুর্বলতা ফলাও করে নিজ দলের প্রসার এ-দেশের রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্ড়ু ওসমানী এরও ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা এবং সময়নিষ্ঠাকে। আমাদের রাজনীতি 'মারি অরি পারি যে

কৌশলে'র রাজনীতি। কিন্ডু রাজনৈতিক কূটকৌশলকে সুন্দরের মোড়কে ঢেকে জনগণের সামনে উপস্থাপনের পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। ফলে 'কথামালার রাজনীতি'র এদেশের উর্বর অঙ্গনে তিনি ছিলেন অনন্য। অনেকেই বলেন, কঠোর নীতিনিষ্ঠা এবং স্পষ্টবাদিতার জন্যে রাজনীতির আসর তিনি জমাতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে, রাজনীতির আসরে হিরো হওয়ার শিরশিরে উচ্চাশায় নয় বরং নিজ বিবেক ও বোধের অনুকূলে রাজনীতির মাধ্যমে গণকল্যাণ নিশ্চিতকরণই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বল্প ও অনুচ্চভাষী জেনারেল ওসমানী তাই মঞ্চে গর্জন করে জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। কথার মারপ্যাঁচে মুগ্ধ করে জনতার হাততালি অথবা জিন্দাবাদের কাঙাল তিনি ছিলেন না। প্রচলিত রাজনীতির ধারায় তিনি তাই এক অনন্য জেনারেল রূপেই নন্দিত। রাজনৈতিক ময়দানে তাঁর বিপক্ষ শিবিরে ওসমানী এসব বিরল গুণের জন্যে উচ্চ প্রশংসিত।

নিখাদ গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ দেশবাসীকে বারবার নাড়া দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তিনি আজীবন ভালোবাসতেন। তাঁর ওপর ওসমানীর ছিল গভীর আস্থা। জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতের শিলিগুড়িতে জাতীয় নেতৃবৃন্দের এক নীতিনির্ধারণ-সভায় ওসমানী বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিনিধিরূপে জনগণ আমাদের ভোট দিয়েছে। তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে একমাত্র মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ড় জীবন থাকতে আমরা নিতে পারি না। সেই ওসমানী বাকশাল গঠনের পর অবলীলায় ছেড়ে দিলেন মন্ত্রিত্ব। ওসমানী তখন সুর চড়িয়ে গালাগাল দিতে পারতেন। কিন্ডু তিনি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও সংযমের বেড়া ভেঙে হইহল- া করেন নি। পরবর্তীকালে দল গঠন করে জনগণের বুদ্ধি ও বিবেকের দরবারে এসে হাজিরা দিলেন।

আটষট্টি উনসত্তরের গণ-জোয়ারের পথ বেয়ে এসেছে সত্তরের নির্বাচন। সে- াগানে সে- াগানে মুখরিত গ্রাম-গ্রামান্ড়র। নির্বাচনে জয়ী হতেই হবে। এই টালমাটাল সময়ে ওসমানীও নির্বাচনে প্রার্থী। জয় তাঁর নিশ্চিত। কর্মী-সমর্থকদের বুক তবু দুর"দুর" করে। অতি উৎসাহী ক'জন তর"ণ একটি ভোটকেন্দ্রে বুথে ঢুকে পড়েছে। আত্মগোপন করে ভোটারদের জানাচ্ছে শেষ আবেদন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষীর হাতে এরা বন্দি হলো। এখন উপায়? হ্যাঁ, ওসমানী শুধু মুখে বলে দিলেই ছেড়ে দেওয়া হবে এদের। কর্মীরা জেঁকে ধরলেন ওসমানীকে। কিন্ডু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জীবন্ড় প্রতীক ওসমানীর দৃঢ়কণ্ঠ হুংকার, 'নো, আমি কি বলেছি আইনের মাথা খেয়ে তোমরা বুথে ঢুকে ক্যানভাস করবে?'

ওসমানীর কথা এবং কাজে, ভেতর এবং বাইরে এক চুলও ফারাক ছিল না। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর এই বিরল অনুরাগের দৃষ্টান্ড় সত্যই দুর্লভ। গণতন্ত্রের নামে অনেকেই গণতন্ত্রকে হত্যা করে বসে। মুখে গণতন্ত্রের দোহাই পেড়ে, এক সময়

ব্যাখ্যায় দিনকে রাত করে বোল পাল্টে গুছিয়ে নেয় আখেরাত। বাক্যবাগীশ এইসব রাজনীতিক এবং এই ধারার রাজনীতিকে তিনি ঘৃণা করেছেন আজীবন।
বঙ্গবীর ওসমানীর দেশপ্রেম শত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন একজন স্টেট্সম্যান। বলা হয়, A politician thinks for the election and a statesman for the next Generation. ওসমানী দেশপ্রেমিক রূপেই জনগণকে ভালোবেসেছেন। নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতার রাজনীতিতে তিনি আসক্ত ছিলেন না। জাতির বিভিন্ন দুর্যোগময় মুহূর্তে দেখা গেছে ওসমানীর নির্দলীয় ভূমিকা। দলীয় স্বার্থের আগে তিনি চিরদিন জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবেছেন। এদিক থেকেও ওসমানী রেখে গেছেন উজ্জ্বল নজির।
আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ছাত্র ওসমানী সৈনিকজীবনে, মন্ত্রিত্বের আসনে এবং রাজনীতির অঙ্গনে, বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি অকৃতদার ওসমানীর ছিল বুকভরা ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রবাহে বিদেশি ইজম আর মতবাদে তিনি তাড়িত হন নি কখনো। প্রায়ই বলতেন, এদেশের মাটি, পানি, বাতাস ও মানুষের সাথে সম্পর্কিত সংস্কৃতিই আমাদের সংস্কৃতি। রাজনীতিতেও আমরণ এই বিশ্বাসে ছিলেন স্থির।
ওসমানী তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করেন নি। এ-তৃপ্তি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ছিল। নিজের বিবেকের কাছে তিনি ছিলেন নির্মল। তাই কোনো দহনে তাঁকে পুড়তে হয় নি। ওসমানী স্রষ্টার ওপর ছিলেন অগাধ বিশ্বাসী। তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতায়ও এ-দিকটা ফুটে উঠেছে।
রণাঙ্গনের বীর ওসমানী অসুস্থ হয়ে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। লায়ন্স ক্লাব ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর মিলিত উদ্যোগে ওসমানীর সিলেটের বাসভবনে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হলো। চিকিৎসার জন্যে লন্ডন যাত্রার প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা তাঁকে জানালেন সংবর্ধনা। সৌভাগ্যবশত সেখানে আমিও হাজির ছিলাম।
১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বরের শেষ বিকেলে সমাবেশে দাঁড়িয়ে ওসমানী পেশ করলেন তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। সংক্ষিপ্ত এ-বক্তৃতায় কিছুটা দুর্বল কণ্ঠে ওসমানী বললেন :
'এই শহরে, এই পরিবেশে, বহুদিন আগে, ৫০ বছর আগে গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষকদের কাছে, আমার মা, বাবার শক্ত হাতের নিচে আমি শিক্ষা লাভ করেছি। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্প্রসারিত করে। কর্তব্যপরায়ণ করে।
আপনারা কবির ভাষায় যতটুকু বলেছেন আমি ততটুকু করতে পারি নি। সব সময় নিজের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আজকে আপনারা যে সম্মান দিলেন,

এটা আমার চিকিৎসকদের জন্যে সহায়ক হবে। আপনারা আমার সুস্থতা কামনা করেছেন। এজন্যে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গেলে নিশ্চয়ই আমি এখানে ফিরে আসবো।

মনে রাখবেন, পবিত্র কোরানে সৃষ্টিকর্তা বলেছেন যে, কিছুই নাই এ ধরায়, যেটা বিনষ্ট হবে না। হিমালয় পর্বতও ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা একটা পেপার ওয়েটারের কাজ দিচ্ছে। তবে থেকে যাবে মহান সৃষ্টিকর্তার আলো, তার রূপ এবং তার একটা উজ্জ্বল প্রভাব।

আমরা সকলেই ক্ষয়শীল। তো ক্ষয় হওয়ার আগে যদি এতটুকু সন্তুষ্টি নিয়ে যান যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, তাহলে এটিই হবে বিরাট সন্তুষ্টি। আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।'*

আপ্রাণ চেষ্টার সন্তুষ্টি নিয়েই ওসমানী মৃত্যুর ভেতর দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী। এ-দেশের স্বাধীনতার চেতনার সাথে মিশে তিনি ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছেন। প্রবাদিক খ্যাতি অর্জন করে এক নিটোল জীবনের প্রেরণা রেখে গেছেন সবার জন্যে। অনাগত দিনেও তিনি নিঃসন্দেহে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

* বক্তব্যটি রেডিও বাংলাদেশ সিলেট কেন্দ্রের সৌজন্যে

সূত্র : নাম তাঁর ইতিহাস

আবদুল হামিদ মানিক (১৯৫৪) : গবেষক ও প্রাবন্ধিক

জেনারেল ওসমানী : তাঁর অন্তর্চেতনার অনন্য কিছু চিত্র

এ কে শেরাম

জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক; যিনি সাধারণ্যে জেনারেল এম এ জি ওসমানী বা শুধুই জেনারেল ওসমানী নামে খ্যাত ছিলেন—যাঁর সমগ্র জীবনচর্যায় ছিলো কঠোর শৃঙ্খলা ও নীতিবোধের শিল্পিত বুননে সাজানো এক অসামান্য জীবনবেদ।

জন্ম এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলায়—যদিও তাঁর পৈতৃক নিবাস সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলার দয়ামিরে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু আসামের কটন স্কুলে— পরবর্তীকালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। পারিবারিক আবহই তাঁর অন্তর্চেতনায় জন্ম দিয়েছিলো এক গভীর নীতিবোধের। পরবর্তীকালে উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁর এই নীতিবোধের পাশাপাশি এক শৃঙ্খলাবোধও জন্ম দিয়েছে। যে কারণেই সম্ভবত পরবর্তী জীবনে ওসমানী ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদানের লোভনীয় সুযোগকে উপেক্ষা করে বেছে নিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর মতো কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন এক সুবিন্যস্ত জীবনকে। নিয়মিত কমিশন লাভের স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতেই মেজর পদ লাভ করেন। তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে তিনিই ছিলেন কনিষ্ঠ মেজর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা রণাঙ্গনে একটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়কত্ব করে সৃষ্টি করেন এক অনন্য নজির।

জেনারেল ওসমানী আশৈশব বেড়ে উঠেছেন এক অবাঙালি আবহে; শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেছেন বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে বহুদূরে—কর্মজীবনেও তিনি পান নি কোন বাঙালি পরিবেশ। কিন্তু তাঁর সমস্ত অন্তর্লোকজুড়ে ছিলো সবুজ-শ্যামলে ভরা এই বাংলা। তিনি ছিলেন প্রকৃতই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। পরবর্তীকালে তাই তিনি বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা দাবির প্রতি ঘোষণা করেছিলেন দ্বিধাহীন একাত্মতা। ওসমানী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। এই রেজিমেন্ট গঠনের প্রথম দিকেই প্রথম বাঙালি অধিনায়ক হিসেবে এই পল্টনে যেদিন যোগ দিলেন লে. কর্নেল এম.এ.জি ওসমানী, সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা আনন্দ আর গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলো—'আমরা বাঙালি, বাঙালি এসেছে আমাদের অধিনায়ক হয়ে।' তারই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ওসমানী বলেছেন, 'তাদের সেই আনন্দধ্বনি আজও আমার কানে বাজছে। সে দিন তাদের সেই আনন্দোল- াসের মধ্যে আমি উপলব্ধি করেছিলাম আমার

সত্যিকার পরিচয়।'[১] কবি নজরুলের 'চল চল চল' গানটিকে তিনিই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মার্চ সংগীত হিসেবে প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে সামরিক বাদ্যে রবীন্দ্রনাথের 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ' এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' গান দুটি সরকারিভাবে প্রচলিত হয়। এছাড়া সেনাবাহিনীতে বাঙালি লোক-ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্তনও ছিলো তাঁর অন্যতম কীর্তি। ওসমানী ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী এক কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেড়ে উঠলেও এবং সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পরও অন্তর্গত চেতনার দিক থেকে ছিলেন প্রবলভাবে গণতন্ত্রী। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার লক্ষ্যেই তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেন এবং সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বালাগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ-গোলাপগঞ্জ ও বিশ্বনাথ সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তানের বৃহত্তম নির্বাচনী এলাকা থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়ে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং সর্বাধিনায়কের গুরুদায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এক অনন্য বিজয় অর্জনের পর স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বাধিনায়কের পদ বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক বাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তবে বাংলাদেশ গণপরিষদের সদস্য হিসেবে ওসমানী সরকারের জাহাজ চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ ও বিমান চলাচল মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনেও জেনারেল ওসমানী বালাগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ-বিশ্বনাথ নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন এবং সরকারের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় 'বাকশাল' ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হয়েছে বলে গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদে সংসদ- সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন।

জেনারেল ওসমানীর ছিলো প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। আজন্ম লালিত তাঁর নীতিবোধ, শিক্ষা ও সৈনিকজীবনে অর্জিত শৃঙ্খলাবোধের সাথে যুক্ত হয়েছিলো তাঁর অন্তর্গত আত্মমর্যাদাবোধ। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি সবসময়ই একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদমর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং-এর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'ওসমানী সাহেব মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতেন এবং সরকারি ও সামরিক আদব কায়দা সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে

তিনি যেখানেই গিয়েছেন, একটা স্বাধীন দেশের সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান হিসেবে মর্যাদা ও সম্মানপ্রাপ্তির দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ওসমানীর দৃঢ় মনোভাব ছিল যে, তিনি স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হলেও দেশের ওপর তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তাঁর দেশের জন্য সাহায্য প্রয়োজন—ভিক্ষা নয়।'[২]

নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর চূড়ান্ড় বিজয় অর্জনের মুহূর্তে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত পাকিস্ড়ানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ওসমানীর অংশগ্রহণ না-করার পেছনেও ছিলো তাঁর সেই প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। কারণ, সেই আত্মসমর্পণের দলিলে বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কোন ভূমিকাই রাখা হয় নি বা সেই অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিত থাকার মতো কোন যোগ্য পরিবেশও সৃষ্টি করা হয় নি। অথবা বলা যেতে পারে বিজয়ের অংশীদারিত্বে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কোন ভাগ থাকুক তা সেদিন অনেকেই চায় নি।[৩]

ওসমানী-চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিকের কথা আমি এখানে উলে- খ করতে চাই। বাংলাদেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালির পাশাপাশি প্রগতির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর যে লোকেরা বসবাস করে তারা স্বভাবতই সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ড়। আধুনিক সভ্যতার জটিল জঙ্গমতা তাদেরকে তেমন স্পর্শ করে নি বলে তাদের নীতিবোধ আজও প্রবল। আর এ কারণেই হয়তো-বা ওসমানী এদের ওপর সহজেই আস্থা স্থাপন করতে পারতেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্ড়ান রাইফেলস (ই.পি.আর)-এর অতিরিক্ত কমান্ড্যান্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে তিনিই প্রথম ই.পি.আর-এ অবাঙালি নিয়োগ বন্ধ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। সিলেটের হয়েও তিনি কর্মব্যপোদেশে সবসময় বাইরে থাকার কারণে সিলেটের মণিপুরি জাতিগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কখনও আসেন নি। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় নাগরিক কমিটির প্রার্থী হিসাবে জেনারেল ওসমানী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তখনই এক নির্বাচনী সফরের সময় তিনি সিলেট শহরের মণিপুরি জনগোষ্ঠীর সাথে এক একান্ড় বৈঠকে বসেন। সেখানে তিনি মণিপুরিদের দুঃখদৈন্যের কথা গভীর অভিনিবেশ সহকারে শোনেন। মণিপুরিরা তাদের একটি গভীর অন্ড়র্বেদনার কথাও সেদিন তাঁকে জানান। মণিপুরি একটি নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার নাম। একটি পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তার সমস্ড় গুণাবলিই তাদের রয়েছে। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, আছে সমৃদ্ধ সাহিত্য এবং ঋদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। এককালের স্বাধীন রাষ্ট্র এবং বর্তমান ভারতের অঙ্গীভূত রাজ্য মণিপুর এবং ভারতের সর্বত্র মণিপুরিরা একটি পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তা হিসেবেই সম্মানিত। অথচ বাংলাদেশে এক ভ্রান্ড় ধারণার বশবর্তী হয়ে সরকারিভাবে

মণিপুরিদেরকে উপজাতি আখ্যায়িত করা হচ্ছে। 'উপজাতি'-এই শব্দবন্ধের প্রায়োগিক অর্থে এক ধরনের তাচ্ছিল্যভাব থাকে যা মণিপুরিদের স্বাভাবিক মর্যাদাবোধকে আহত করে বলে তারা এই আখ্যায়নের প্রবল বিরোধী। এ কারণেই তারা মণিপুরিদেরকে উপজাতি আখ্যায়িত না-করে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তা হিসেবে আত্মসম্মানবোধ নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ দানের দাবি জানায়। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ওসমানীর হৃদয়ে মণিপুরিদের তীব্র অন্ড় র্বেদনার এই বিষয়টি গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিনি অত্যন্ড় প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করেন যদি কোনদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পান তাহলে অবশ্যই তিনি মণিপুরিদের এই গ- ানিমোচনের বিহিত ব্যবস্থা নেবেন। কিন্ড়ু দুর্ভাগ্য, সে সুযোগ তিনি পান নি। এরপর আর তিনি খুব বেশি দিন বেঁচেও ছিলেন না।

আমাদের সমাজে এখন কেবলই নষ্ট আর ভ্রষ্টদের ভিড়। অবৈধ অর্থ আর পেশিশক্তির কাছে অসহায় আজ আমাদের জীবন। অসততা আর নীতিহীনতার চাপে খর্বকায় বামনেরাই এখন আমাদের দ ুমু ের কর্তা। সমাজের এই অসংখ্য ন্যুব্জ আর বামনের ভিড়ে আপন চারিত্রিক দার্ঢ্যে ওসমানী ছিলেন বিরল ব্যতিক্রমভাবে ঋজু আর দীর্ঘকায়। তাঁর জীবন ও কর্ম আলোকিত করেছে আমাদেরকে। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অনিঃশেষ।

তথ্যসূত্র :

১. শরীফউদ্দিন আহমদ/সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য (সম্পাদিত)/বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি/১৯৯৯/পৃ. ৫৮০
২. এম আর আখতার মুকুল/আমি বিজয় দেখেছি/সাগর ১৩৯১/পৃ. ৩১০
৩. মো. আব্দুল আজিজ/বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সর্বাধিনায়ক ওসমানী/ সময় ২০০০/ পৃ. ১০০

এ কে শেরাম (১৯৫৩) : কবি ও গবেষক, সভাপতি, বাংলাদেশ মণিপুরি সাহিত্য সংসদ, সিলেট

ওসমানী জাদুঘর
এস.এম জালালউদ্দিন

পৃথিবীতে সব মানুষই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেন না। কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা মরে গিয়েও স্বমহিমায় অমর হয়ে থাকেন। জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী তেমনই এক ব্যক্তিত্ব। যিনি আপন কৃতকর্মের মাধ্যমে জাতির হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করে আছেন।

বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন মহান স্বাধীনতা। আর এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী জাতির অহংকার বয়ে আনেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্ড়ক বাঙালি এবং প্রচারবিমুখ নির্ভেজাল একজন দেশপ্রেমিক। জীবদ্দশায় তিনি জাতির যে কোন দুর্যোগ মুহূর্তে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। জাতিকে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে হয়েছেন এই সর্বত্যাগী মহান পুর"ষ।

ওসমানীর পিতা খান বাহাদুর মফিজুর রহমান ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সিলেট শহরের নাইওরপুল মহল- ায় জমি ক্রয় করে বাংলো টাইপের বাড়ি নির্মাণ করেন। ওসমানীর অনুরোধে বড়ভাই নূর"ল গণি-এর নামে তাঁর পিতা শেষবয়সে বাড়িটি দলিল করে দেন। পরে বড়ভাই ওসমানীর নামে এ বাড়িটি লিখে দেন। ভাইয়ে ভাইয়ে সুসম্পর্কের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেহেতু ওসমানী ছিলেন চিরকুমার সেহেতু তিনি মৃত্যুর পূর্বে পিতামাতার নামে 'দি জোবেদা খাতুন খান বাহাদুর মফিজুর রহমান ট্রাস্ট' করে যান। ট্রাস্টের উদ্দেশ্য ছিল গরিব ও মেধাবী মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধে ওসমানীর অবদান, আজীবন দেশপ্রেমের স্বীকৃতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখতে নুর মঞ্জিলকে জাদুঘর হিসাবে প্রতিষ্ঠাকল্পে ট্রাস্টের সঙ্গে কিছু শর্তসাপেক্ষে দীর্ঘমেয়াদি লিজ গ্রহণ করে। সেই থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ কিছু সংস্কার করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন ওসমানী জাদুঘর হিসাবে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

ওসমানী জাদুঘর ভবনের আয়তন ২,৪০২ বর্গফুট। নিদর্শন সংখ্যা ৪৭৩টি। গ্যালারি সংখ্যা ৩টি। কর্মরত স্টাফ ১১ জন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চ উদ্বোধনের পর থেকে নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ড় ৪ লাখ ৬৭ হাজার ১শ' ৪০ জন দর্শক (৪,৬৭,১৪০) জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ২৫/৩০ জন দর্শক জাদুঘর পরিদর্শন করেন। শনিবার থেকে বুধবার সকাল ৯.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪.৩০ মি. পর্যন্ড় এবং শুক্রবার বিকাল ৩.০০টা থেকে রাত ৮টা

পর্যন্ড় দর্শকদের জন্য জাদুঘর খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার ও সরকারি ছুটির দিন জাদুঘর বন্ধ থাকে।

জাদুঘরের ৩টি গ্যালারিতে বঙ্গবীর ওসমানীর ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রথম গ্যালারিতে ওসমানীর ব্যবহৃত খাট, বইপুস্ড়ক, বেতের চেয়ার, জামা কাপড়সহ শিশুকাল থেকে জীবনের শেষ জন্মবার্ষিকী উদযাপনসহ বিভিন্ন সময়ের কিছু আলোকচিত্র রয়েছে। এছাড়া রয়েছে যৌবনকালে সেনাবাহিনীর অফিসার হিসাবে একটি বড় পেইন্টিং।

দ্বিতীয় নম্বর গ্যালারিতে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী বেতের সোফাসেট, সামরিক ব্যাজ, পাসপোর্ট, বিভিন্ন উপহার সামগ্রী, রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে ছবি, মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকবাহিনী-কর্তৃক ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃশংস হত্যার চিত্র, ভারতে আশ্রয়ের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ, শরণার্থী শিবিরের চিত্রসহ আরও আছে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের চিত্র। কিন্ড়ু আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে সর্বাধিনায়কের অনুপস্থিতির বিষয়টি আজও জাতির কাছে পরিষ্কার নয়।

৩ নম্বর গ্যালারিতে রয়েছে কাঠের চেয়ার টেবিল। যেখানে বসে ওসমানী লেখাপড়া করতেন। ডাইনিং টেবিল, ফ্রিজ কিছু আলোকচিত্র, জায়নামাজ, টুপি এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সর্বাধিনায়ককে অভিনন্দন জানিয়ে মানপত্র, ওসমানী-কর্তৃক ব্যবহৃত মানচিত্র। যুদ্ধ পরিচালনায় এ-মানচিত্রটি তিনি ব্যবহার করেছেন।

আরও কিছু নিদর্শন স্টোরে রক্ষিত আছে। সেগুলো পর্যায়ক্রমে প্রদর্শনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। তাছাড়া ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাবার সময় দুই সকেস ভর্তি কাপড় চোপড় সঙ্গে নিয়েছিলেন। এগুলো আর পরবর্তীকালে দেশে আসে নি। এসবের সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত ঘড়ি, চশমা, কলম, ছোট কোরান শরিফ, একটি টাইপ রাইটার ছিল—এগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা চলছে। এ সমস্ড় নিদর্শন সংগ্রহ করতে পারলে জাদুঘর আরও সমৃদ্ধ হবে।

আপাতদৃষ্টিতে ওসমানী জাদুঘর ছোট এবং এর নিদর্শন সাধারণ মনে হলেও এর গভীরতা অনেক বড় এবং বেশি। ওসমানী সম্পর্কে সবার ধারণা যে, তিনি ছিলেন খুব মেজাজি এবং ভোগবিলাসী জীবনযাপন করতেন। আসলে ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন খুবই অমায়িক এবং সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ড়। ওসমানী জাদুঘর পরিদর্শন করলে ওসমানী সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা পাওয়া যায় যে, তিনি কত সহজসরল জীবনযাপন করতেন। তিনি ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্ড়ু তিনি ছিলেন সবসময় নিয়মতান্ত্রিক। তিনি নিজে কঠোরভাবে নিয়ম মানতেন এবং অন্যকে নিয়ম মানতে উৎসাহ দিতেন। ওসমানী আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্ড়ু তিনি রেখে গেছেন অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর

আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। জেনারেল ওসমানী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অগ্নিপুরুষ—যাঁর নাম ইতিহাসের পাতায় চির স্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

এস.এম জালালউদ্দিন : সহকারী কিপার ওসমানী জাদুঘর, সিলেট

গণতন্ত্রী ওসমানী

খলিলুর রহমান

রাজনীতিতে ওসমানী ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। সত্য কথাটি সোজা করে বলাই ছিল তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। ইংরেজিতে যাকে Tact বলে সে শব্দটি তাঁর অভিধানে ছিল না। প্রশ্ন করলে বলতেন, Tact এবং অসত্যের মধ্যে আমি বেশি পার্থক্য খুঁজে পাই না। রাজনীতির ভাষায়, Tact কথাটি অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় Political । সেই হিসাবে তাঁর সহকর্মীরা ভাবতেন, তিনি Non political অর্থাৎ অরাজনৈতিক। তবে যে কথাটি তিনি অরাজনৈতিক ভাষায় কয়েক বছর আগে বলে গেছেন—তাই কয়েক বছর পরে রাজনীতিকরা রাজনীতির ভাষায়ও বলতে বাধ্য হয়েছেন।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর অত্যন্ড় প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে বাকশাল নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেন এবং পরে সংসদ ও পার্টির সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সেদিন তিনি ছিলেন একা। কিন্ড়ু একাকিত্ব, ভবিষ্যৎ চিন্ড়া ও স্বার্থবুদ্ধি তাঁর বিশ্বাসকে টলাতে পারে নি। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সংসদীয় গণতন্ত্রে। সেই মূলমন্ত্রের ওপরই ভিত্তি করে '৭২-এর সংবিধান: আজীবনের স্বপ্ন ওসমানীর। সে সংবিধানের কোন মৌলিক পরিবর্তনে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর পদত্যাগ। সেদিন তাঁর কোন রাজনৈতিক সহকর্মীই তাঁর সিদ্ধান্ড়কে বাস্ড় ববুদ্ধিসম্মত ভাবতে পারেন নি। কিন্ড়ু মাত্র কয়েক বছর পরই তাঁর সহকর্মীগণ '৭২-এর সংবিধানের পক্ষেই রায় দিতে বাধ্য হন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় আসেন সেদিন অনেকেই সামরিক শাসনের পক্ষে মত দিয়েছিল। রাজনীতিকরা ব্যর্থ হয়েছেন একথা ছিল সেদিন মুখে মুখে। বহু রাজনৈতিক নেতা জিয়া সরকারে যোগদান করে '৭২-এর সংবিধানকে পুনরায় সংশোধন করে বিবৃতি দিয়েছেন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্ড়ু আজকের পরিস্থিতিতে তাঁরাও উপলব্ধি করেছেন আমাদের দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান একমাত্র '৭২-এর সংবিধানই দিতে পারে। ওসমানী জিয়ার আমলেও সর্বোচ্চ কণ্ঠে এবং সর্বতোভাবে '৭২-এর সংবিধানের প্রবক্তা ছিলেন।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে দাবি করেন দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে সশস্ত্রবাহিনীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে। অনেক রাজনীতিবিদ এ-কথার ভিতর সারবত্তা খুঁজে পেয়েছিলেন এবং এ-ধারণাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। এরশাদ ব্যক্তিগতভাবে ওসমানীর প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও ওসমানী

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ করে '৭২-এর সংবিধান ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা পুনরায় প্রকাশ করেছিলেন।

অথচ রাজনৈতিক মহলে একটা সাধারণ বিশ্বাস ছিল ওসমানী অরাজনৈতিক অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁর কম। কিন্তু আসলে এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

পাকিস্তান আমলেও ওসমানী বিশ্বাস করতেন পাকিস্তানের শাসনকর্তারা পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার দিচ্ছে না। প্রথমদিকে বেসামরিক শাসনামলে তিনি মূলত সশস্ত্রবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য অংশের জন্য সংগ্রাম করতেন এবং তা করতে গিয়ে তাঁর চাকুরির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সবর্তোভাবে নষ্ট করতে হয়েছে। কিন্তু তখন ওসমানী যুবক এবং নিজ বিশ্বাসে দৃঢ় অটল। কিন্তু ওসমানী ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানের মূলমন্ত্রে যেকোন পশ্চিম পাকিস্তানির চাইতে বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ অদৃষ্টের পরিহাস তাকেই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল।

আইয়ুবের শাসনামলে ওসমানী কেবল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য সামরিক অংশের জন্যই সংগ্রাম করতেন না, করতেন আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হিস্যার জন্যও। তখনই ওসমানীর চাকুরির ভবিষ্যৎ পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়। কিন্তু আপস কথাটি ওসমানীর বইয়ে ছিল না। অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে তিনি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নেন একজন কর্নেল হিসাবে। তাঁর সঙ্গীরা তখন জেনারেল।

ব্যক্তিগতভাবে ওসমানী ছিলেন অত্যন্ত শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন। যখন সামরিক বাহিনীর চাকুরিতে ছিলেন তখন তিনি রাজনীতিতে পরোক্ষভাবেও অংশগ্রহণ করেন নি। কাজেই সেনাবাহিনীর রাজনীতিতে আসা তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। বলতেন, যদি রাজনীতি করতে হয় তবে উর্দি ছেড়ে এসো, উর্দি পরে নয়।

তিনি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতেন, রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হলে সেনাবাহিনীর সামরিক মূল্য থাকে না। সামরিক বাহিনী হিসাবে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তিনি কখনও আপস করেন নি।

রাজনীতিতেও তিনি মূল্যবোধেই বিশ্বাস করতেন। ভোট চাওয়ার সময়ও তিনি কোন কাজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন না। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবেন—এই একমাত্র প্রতিশ্রুতি হাতে নিয়েই তিনি নির্বাচনে নেমেছিলেন। কেউ কোন তদবির করতে এলেও তিনি বাছবিচার করে তদবির হাতে নিতেন। যেটা করা উচিত নয় কিংবা যেটা পারবেন না, তা মুখের ওপর বলে দিতেন এজন্য অনেকে তাঁকে অরাজনৈতিক বলতেন।

ওসমানীর মর্যাদাবোধ ছিল অসামান্য। স্বকীয় মর্যাদা তিনি নিজ স্বার্থের ওপর গণনা করতেন। আর জাতীয় মর্যাদা তিনি ধর্মবিশ্বাসের পরেই স্থান দিতেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের কল্পনা কখনও স্থান পেতো না।

অবসরগ্রহণের পর আইয়ুব খান তাঁকে একটি উচ্চমর্যাদার বেসামরিক চাকুরি গ্রহণের প্রস্ড়াব দিয়েছিলেন, ক্ষণিক চিন্ড়া না-করেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলেছিলেন ওসমানীর বাস্ড়ব বুদ্ধির অভাব।

মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক থাকাকালীন তিনি জাতীয় মর্যাদা রক্ষার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। জেনারেল অরোরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে ওসমানী বলেছিলেন, আমি বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক, আমার সমকক্ষ অরোরা নয়, মানেকশ (ভারতীয় চিফ অভ স্টাফ)। জেনারেল পদবির হলেও অরোরার সাথে আলোচনা করেন নি, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের মর্যাদার খাতিরে।

অথচ ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ড় নিরহংকারী এবং বিনয়ী। একজন সিপাহি দেখা করতে এলেও সাদরে তাকে সোফায় বসাতেন। সহযোগী হিসাবে সম্মান দিতেন। সম্পত্তি ও বিলাসিতার প্রতি ছিল তাঁর অনীহা।

আজ দেশে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। এই অবক্ষয়ের যুগে ওসমানী তাঁর উঁচুমানের মূল্যবোধ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি সম্যকভাবে খাপ খান নি আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে। আর কয়েক বছর পর যখন ঘাত-সংঘাতে আমাদের মূল্যবোধ উন্নতমানের হবে তখন ওসমানীর আবির্ভাব হলে তিনি জাতির নেতৃত্ব আরও কার্যকরভাবে দিতে পারতেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

সূত্র : নাম তাঁর ইতিহাস

খলিলুর রহমান: মেজর জেনারেল (অব.)

তাঁকে সালাম জানিয়ে আমরা গৌরববোধ করি

দেওয়ান ফরিদ গাজী

মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী, যাঁর সমধিক পরিচিতি এম.এ.জি ওসমানী নামে, একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনযাপন, রাজনীতি, সমরনীতি, ব্যক্তির ুচি প্রায় সকল মহলের পরিজ্ঞাত। তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই। উদারমনস্ক, বহুদলীয় গণতন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এই সমাজ ও রাষ্ট্রভাবুকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুযোগ ঘটেছিল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে। এরও আগে তাঁর চাকরিজীবনে দুএক বছর পর পর দেখা হতো। মূলত পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনী থেকে তিনি অবসরগ্রহণের পরই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে; আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলতাম, রাজনীতিতে আসুন। উত্তরে ওসমানী বলতেন, 'Let me think'. একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বললাম : ওসমানী সাহেব অবসর জীবনযাপন করছেন, রাজনীতিতে হয়তো আসতে চান। তিনি বললেন, কথা বলে দেখো, যদি আওয়ামী লীগে যোগ দিতে চান, ভালো। বঙ্গবন্ধুর আগ্রহ দেখে আমি ওসমানী সাহেবের এক আত্মীয় মুজিবুর রহমান চৌধুরীকে বললাম, তিনি যেন তাঁকে (ওসমানীকে) বলেন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। দিন তারিখ মনে নেই, পরবর্তীকালে তিনি দেখা করেন এবং আমাকে জানান, তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছে কিছু প্রস্ড়াব পেশ করেছেন। যেমন : অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র বিষয়ক প্রাসঙ্গিক প্রস্ড়াবনার কথা। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর প্রস্ড়াবনার বিষয়গুলো যে বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচির মধ্যে আছে তা-ও ওসমানী সাহেব আমাকে জানিয়ে ছিলেন। অবশেষে তিনি ১৯৭০-এর জুলাই মাসে ছয়দফার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও বিশ্বনাথ নিয়ে গঠিত পাকিস্ড়ানের বৃহত্তম নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনি তাঁর চারজন প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরাজিত করে বিপুলসংখ্যক ভোট পেয়ে জাতীয় পরিষদে জয়লাভ করেন। এরপর নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পর্যন্ড় যে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে ওঠেছিল বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে বললেন : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' তখন কিছুসংখ্যক সাম্প্রদায়িক দল ও ব্যক্তি ছাড়া সমগ্র বাঙালি জাতি দলমতনির্বিশেষে পাকবাহিনীর মোকাবিলা করে। শুর ু হলো সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। জেনারেল ওসমানী মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। তার আগে

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর আমরা ভাবতাম, আমাদের দলে ওসমানীর মতো একজন অবসরপ্রাপ্ত জাঁদরেল কর্নেল আছেন, একজন জনপ্রতিনিধি এম এন এ আছেন। তিনিই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন। তিনি বলতেন, আমি তো আছি, সবাই একসঙ্গে কাজ করে যাবো।

যুদ্ধ শুরু হলে প্রবাসী সরকার-কর্তৃক ১১ সেক্টরে ১১ জন বেসামরিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হলো। আমি ৪ ও ৫ নম্বর সেক্টরে বেসামরিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। তাছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রশাসনিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ওই এলাকার এম পি এবং এম এন এ-বৃন্দ স্ব স্ব অঞ্চলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। দ্বৈত দায়িত্বে থাকায় সরকারের সকল প্রতিনিধি বিশেষ করে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হতো। যুদ্ধের সময় তাঁর দায়িত্ব ছিল সামরিক বাহিনীর লোকজনকে দেখাশোনা করা। তাছাড়া তিনি একজন নির্বাচিত এম এন এ; সিলেটের সকল সমস্যা সমাধানে তিনিই তৎপর ছিলেন সর্বাধিক। এ-জন্য কিছু সামরিক বাহিনীর অফিসারের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জরণ ছিল, ওসমানী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, কমান্ডারের দায়িত্বে একজন একটিভ সার্ভিস হোল্ডার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক, তাই বাংলাদেশ সরকার সার্বিক বিবেচনা করে একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার ওসমানীকেই সামরিক বাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাছাড়া একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে সকলের কাছে ছিল তাঁর ঈর্ষণীয় গ্রহণযোগ্যতা। তিনিও যুদ্ধকালীন প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। প্রতিটি সেক্টর কমান্ডারের কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধের কৌশল জানতেন এবং তাঁদেরও সহযোগিতা করতেন। কৌশল বাতলে দিতেন। বৃহত্তর সিলেটের জনপ্রতিনিধিগণ প্রায়ই একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করতাম এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত হতাম। ওই সময়ে আমাদের অফিস ছিল শ্রীমঙ্গল পৌরসভা ও মৌলভীবাজার পার্টির অফিস। মৌলভীবাজার থেকেই বৃহত্তর সিলেটের নানা জায়গায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। শেরপুরে তিনি এসে তৎকালীন সেনা অফিসার মেজর সি আর দত্ত, কর্নেল নূরুজ্জামান, মেজর খালেদ মোশাররফ, বর্তমান ব্রিগেডিয়ার আজিজ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শ করতেন এবং শেরপুর যুদ্ধে আমরা যখন মৌলভীবাজারে পিছু হটে এলাম তখন প্র্যাকটিকেলি সমগ্র সিলেট জেলার মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটতে লাগলো। আশ্রয় নিলো সীমান্তবর্তী এলাকায়।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ দেশ স্বাধীন হলে জেনারেল ওসমানী আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে অধিকতর তৎপর হয়ে উঠলেন। খুন-রাহাজানি বন্ধ করতে প্রতিটি জেলায় ছুটে

গেলেন এবং বেসামরিক উপদেষ্টাদের সহযোগিতায় সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে কাজ করতে লাগলেন। স্বাধীনতার পর কিছু আলবদর, রাজাকার ও এক শ্রেণীর উশৃঙ্খল যুবক মুক্তিযোদ্ধা সেজে নানাভাবে জনগণকে অত্যাচার নির্যাতন করতে ছিল। এই নৈরাজ্যময় অবস্থা থেকে শান্তিপ্রিয় নিরীহ মানুষকে জেনারেল ওসমানী মুক্ত করার জন্য অসামান্য অবদান রাখেন।

এম.এ.জি ওসমানীর যুদ্ধপরবর্তী অবস্থান প্রায় সকলেরই জানা। তিনি out and out এক democrat ছিলেন। আওয়ামী লীগ যখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তখন তিনি প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করেন এবং আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। এরপর তিনি জাতীয় জনতা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে একদলীয় বাকশালের বিরোধিতা করেন এবং সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে জাতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ওই সময় কিছুসংখ্যক উশৃঙ্খল সামরিক বাহিনী খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্ট যা ঘটেছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে লোমহর্ষক ও ঘৃণ্য ঘটনা হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর আওয়ামী লীগ সংগঠিত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। তখন মেজর জিয়াউর রহমান হ্যাঁ, না ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু জেনারেল ওসমানী ছিলেন তাঁর বিপরীত। কখনই ছিল না জিয়ার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক। তিনি হ্যাঁ-না ভোটেরও ছিলেন প্রবল বিরোধী এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আপসহীন—গণতন্ত্র উদ্ধারে লড়াকু সৈনিক। সৈনিকের মর্যাদা নিয়েই তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে সালাম জানিয়ে আমরা গৌরববোধ করি।

অনুলিখন : **আবিদ ফায়সাল**

দেওয়ান ফরিদ গাজী : রাজনীতিবিদ, সাবেক প্রতিমন্ত্রী-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মরণজয়ী ওসমানী

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

সাধারণত বয়ঃকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পরে তার সম্বন্ধে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। এক্ষেত্রে সে-নীতির ব্যতিক্রম হিসেবেই আমায় জেনারেল ওসমানীর জীবন সম্বন্ধে লিখিত হচ্ছে। আর তা লিখতে গিয়ে সিলেটের অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বাধ্য হয়েই আমাকে কয়েকটি কথা বলতে হচ্ছে।

সিলেটের অতীত ছিল গৌরবময়। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে সিলেটের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় পঞ্চখণ্ড ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের ভূমিতে কামরূপের রাজা ভাসকর বর্মা ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করেছেন। ব্রাহ্মণের দানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির প্রসঙ্গও দেখা দেয়। কারণ তৎকালে ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধারক ও সংরক্ষক। সপ্তম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতেও এভাবে বিভিন্ন যুগের রাজাকর্তৃক ভূমিদানের প্রমাণ রয়েছে। এজন্য সে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা তাতে বজায় রয়েছে বলেই অনুমান করা যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হজরত শাহজালাল-কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পরে ইসলামের যে আলোক এ-অঞ্চলে প্রবেশ করে, তার ফলে যে সংস্কৃতি বা তমদ্দুন গড়ে ওঠে, তাকে সর্বতোভাবে ইসলামি-সংস্কৃতি বলা যায়। কারণ সে-সংস্কৃতির মধ্যে তখন এদেশীয় সংস্কৃতির কোন মিশ্রণ সম্ভবপর হয় নি। এ যুগে উত্তর ভারতে ছিল তুর্কি (পাঠান) সম্রাটদের আধিপত্য। তুর্কি সম্রাটগণ ইমান আকিদার দিক দিয়ে মুঘলদের চেয়ে অনেক উন্নত পর্যায়ের ছিলেন। এজন্য সিলেটের সংস্কৃতিতে ইসলামি প্রভাব এখনও বর্তমান।

তবে সে যুগে এবং পরবর্তীকালে মুঘলদের আধিপত্যের সময় হিন্দু সমাজে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়—তুর্কি যুগে চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে এবং মুঘল যুগে জগন্মোহন গোস্বামীর অভ্যুদয়। যদিও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়েছিল নবদ্বীপে। তবু তিনি তাঁর এ ভাবধারা তাঁর পিতৃ বংশের নিকট থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা ঢাকাদক্ষিণ নিবাসী জগন্নাথ মিশ্র মনেপ্রাণে খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন এবং এজন্য সে ধর্ম যথাযথ পালন করার উদ্দেশে সপত্নী নবদ্বীপে গমন করেন।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পরে সিলেটের লাউড়ে যে বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্র গড়ে ওঠে—তাতেও প্রমাণিত হয়—চৈতন্য দেব প্রবর্তিত এ-বৈষ্ণব ধর্মের জন্য সিলেটের মাটি সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিল।

১২১৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খাঁর সেনাপতির নিকট মৌলভীবাজার মহকুমার অন্তর্গত লম্বোধরপুরের যুদ্ধে পাঠানবীর খাজা উসমান খান লোহানীর পরাজয়ের ফলে সিলেটের তথা সমগ্র বাংলাদেশের বুকে মুঘলদের

একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘলদের আধিপত্যের পর থেকেই সিলেটের মুসলমানদের সংস্কৃতিতে মোগলাই কালচারের প্রভাব বিরাটভাবে দেখা দেয়। তখন থেকেই নানা ইসলাম বিরোধী ভাবধারা তাদের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে।

তবে তাতেও হিন্দু সমাজের এক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—যার ফলে হবিগঞ্জের বাঘামুরা নিবাসী জগন্মোহন গোস্বামী এক অভিনব ধর্ম প্রচার করেন। এ-ধর্মমতে ভগবান নিরাকার, কাজেই তার সাকার পূজার কোন প্রয়োজন নেই। এ মতবাদেরই পরবর্তী ধর্মনায়ক রামকৃষ্ণ গোসাঁই সম্রাট আকবরের শাসনকালে জন্মগ্রহণ করে তাদের বিশিষ্ট প্রত্যয় প্রচার করে গেছেন।

এতে এ-কথাই প্রমাণিত হয়—সিলেটের বুকে যুগে যুগে ধর্মীয় বিপ- ব দেখা দিয়েছে এবং ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বে এ-অঞ্চলের সংস্কৃতি অত্যন্ড় উচ্চপর্যায়ের ছিল।

হজরত শাহজালাল ছিলেন সোহরাওয়াদিয়া তরিকার সুফি। তিনি এ অঞ্চলে ইসলামের যে-রূপ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তা ছিল—রাজপুর ষের সংশ্রব বর্জিত বিশুদ্ধ ইসলাম। এজন্য তার অনুষঙ্গী দরবেশগণের মধ্যেও সে বিশুদ্ধ ইসলামই ছিল ক্রিয়াশীল। হজরত শাহজালাল ছিলেন তাঁর সঙ্গী ৩৬০ জন আউলিয়ার মধ্যে চাঁদের মতো এবং তাঁর অনুষঙ্গীগণ ছিলেন এক একটা তারকার মতো। তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ছিলো সর্বতোভাবে তাঁকে অনুসরণ করা।

জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণির পূর্বপুর ষ শাহ নিজামউদদীন ওসমানী ছিলেন হজরত শাহজালালের সিলেট অভিযানকালীন অনুষঙ্গী। এজন্য এ পরিবারে সে ঐতিহ্য পূর্বাপর বর্তমান ছিল। জেনারেল ওসমানীর পিতামহ মৌলবি আবদুস সুবহান ছিলেন একজন অত্যন্ড় উচ্চপর্যায়ের সুফি। তাঁর স্বগ্রাম দয়ামিরে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শরিয়তের বিধিবিধান যথাযথ পালন করে তিনি মেহমান মুসাফিরের সেবাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এ-মেহমানদারির কাহিনী এখন সিলেটের বুকে ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। দয়ামিরের অবস্থান এমন এক স্থানে ছিল, যাতে মৌলভীবাজার থেকে আগত রাহিদের পক্ষে সিলেটে পৌঁছার পূর্বে সন্ধ্যা সমাগম হলে, তাদের বাধ্য হয়েই দয়ামিরের যে দয়ালু সুফি আবদুস সুবহান সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হতো। সুদূর শাল- া, দিরাই, ধর্মপাশা, তাহিরপুর প্রভৃতি ভাটি অঞ্চলের থানার যে সকল লোক করিমগঞ্জ থেকে গর বা মহিষাদি খরিদ করে নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তন করতে চাইতো—তাদের পক্ষেও অনেক সময় দয়ামিরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করা অনিবার্য ছিল। এখনও প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে, ওই মেহমান মুসাফিরদের সেবা সুফি আবদুস সুবহান সাহেব স্বহস্ড়ে গ্রহণ করতেন। তাদের জন্য শীতের মৌসুমে

গরম পানি সরবরাহ করা, তাদের গায়ে বেদনা দেখা দিলে ডলে দেওয়া, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের পদসেবা করাও তিনি কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করতেন।

এহেন সুফির জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন মফিজুর রহমান সাহেব। তিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'এ' কোর্সে বি.এ পাস করেন। তখনকার দিনে বিজ্ঞানবিভাগকে বি.এস.সি না-বলে 'এ' কোর্স বলা হতো। ডিগ্রি লাভের পরে তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও আই.সি. এস পদে নিয়োগ না-পেয়ে, তখনকার দিনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োজিত হন। তিনি দীর্ঘকাল সুনামগঞ্জে এ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে সুনামগঞ্জ এখনও প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে তিনি পথেঘাটে, যথাতথা, ফরিয়াদিদের নানাবিধ দুঃখদুর্দশার কথা অত্যন্ড় ধৈর্য সহকারে শুনতেন। তিনি সুনামগঞ্জের মহকুমা হাকিমের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে একটি ঘটনা ঘটে গেলো। সুনামগঞ্জ থানার এলাকাধীন পাগলার নিকটবর্তী একটা গ্রামের লোককে তার পাড়াপ্রতিবেশী ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোকেরা ভীষণ মারপিট করে। তার কোন অপরাধ ছিল না। তার একখ" বোরো জমি ছিল ওদের বৃহদায়তনের জমির মধ্যে অবস্থিত। তারা তাকে এ-জমি তাদের বরাবরে হস্ড়ান্ড়র করার জন্য নানাভাবে চাপ দেওয়া সত্ত্বেও সে তাতে রাজি হয় নি। এজন্য পৌষ মাসের সকালে সে যখন তার জমিতে রোয়া বুনতে আরম্ভ করে, তখন সে দুর্দান্ড় দলের লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে তাকে আক্রমণ করে লাঠিসোঁটা দিয়ে ভীষণ প্রহার করে। তাদের এ-অমানুষিক অত্যাচারের ফলে সে বেচারা অজ্ঞান হয়ে ধানের জমিতেই পড়ে থাকে। পরে হুঁশ ফিরে এলে, এ- রক্তাক্ত অবস্থায়ই সুনামগঞ্জে যেয়ে থানার দারোগার কাছে এজাহার দেবার জন্য ছুটে চলে। থানায় পৌঁছে তার এ নিদার"ণ কাহিনী বলার পূর্বেই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার খেকিয়ে উঠে তাকে থানা থেকে বিদায় করে দেয়। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় তার অজ্ঞানাবস্থার সুযোগ পেয়ে আততায়ীগণ থানায় এসে দারোগাকে প্রচুর সেলামি দিয়ে, তার আগমনের পূর্বেই তাকে প্রত্যাখ্যানের ব্যবস্থা করেছে। এ অন্যায়ের আর কোন প্রতিকার নেই বিবেচনা করে, লোকটা আবার কেঁদে কেঁদে তার বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দেয়। পথিমধ্যে মলি- কপুরের একজন লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সে লোকটা তার এ-দুর্দশার কাহিনী শুনে স্বয়ং বড় হাকিমের নিকট তার অত্যাচারের বিবরণ ও দারোগার প্রত্যাখ্যানের কথা বলার জন্য তাকে পরামর্শ দেয়। সে আরও বলে দেয়, সে যেন দিনের বেলা এত লোকের সামনে তার এ-দুর্দশার কথা না-বলে, সন্ধ্যা-সমাগমকালে তাঁর বাংলোর নিচে বসে থাকে। তখন কোন পুলিশ ও প্রহরী থাকবে না, তখন নিচে থেকে বের হয়ে তাঁর বাংলোর ঠিক মধ্যভাগের দরজাতে যেন সে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকে।

তিনি খুব ভোরে ফজরের নামাজ আদায় করে, সে দরজা দিয়েই বের হবার সময় যেন তাঁর কাছে তার দুর্দশার কথা বলে।

তার পরামর্শ মতে কাজ করে, সে দরজা হেলান দিয়ে গভীর রাতে গাঢ় নিদ্রা উপভোগ করাকালে, তিনি দরজার ভিতর থেকে বের হতে না-পেরে, অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে এসে দেখতে পান, সর্বাঙ্গ রক্তে আপ- ুত একজন লোক তাঁর এখানে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে। তাকে একটু জোরে ঠেলা দিতেই সে তার সামনে একজন মুনশি সাহেবকে দেখতে পায়। কারণ তিনি তাঁর বাসায় সর্বদাই সাদা তহবন্দ, পাক কলি- দার কুর্তা ও দুকলি- টুপি পরতেন। মুনশি সাহেবের চেহারাতে মায়াদয়ার চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে বলে তার মনে সাহসের সঞ্চার হয়। এজন্য তাঁর কাছে আনুপূর্বক সব ঘটনাই বলে। তিনি তাকে তাঁর বাংলোর এক কোণে বসে থাকতে নির্দেশ দিয়ে, তাঁর অফিসের নানা কাজে ব্যস্ড় হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে জেইলার এসে উপস্থিত, পুলিশের ইনস্পেকটর এসে উপস্থিত। তারা সকলেই তাঁকে যথারীতি সালাম করে, তাঁর কাছ থেকে দস্ড়খত ইত্যাদি গ্রহণ করলে একজন চাপরাসিকে সে জিজ্ঞেস করে ইনি কে? তাঁকে বড় হাকিম বলে উলে- খ করায় তার মনে আবার ভীতি দেখা দেয়। কারণ তাঁকে সে মুনশি সাহেব বলে পূর্বে সম্বোধন করেছে। এজন্য ভীত হয়ে আবার দৌড়াতে থাকে। তিনি তার এ-সন্ত্রাসিত অবস্থা লক্ষ করে একজন কনস্টেবলকে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আদেশ করেন। তবে কনস্টেবল তার পিছু ধাওয়া করলে সে লোকটা মরিয়া হয়ে দৌড়াতে থাকে। যা হোক তার নিজের দুর্বলতার জন্যই হোক অথবা কনস্টেবলের শারীরিক শক্তি তার চেয়ে অধিক হওয়ার জন্যই হোক অর্ধমাইল অতিক্রম করতে না-করতে, কনস্টেবল তাকে ধরে ফেলে। তখন তার কাছে মিনতি করে মুক্তি পাওয়ার জন্য লোকটা অস্থির হয়ে পড়ে। তাকে নানা আশ্বাস দিয়ে আবার বড় হাকিমের কাছে নিয়ে চলে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে ডেকে পাঠান এবং এ-কেস কেন রেকর্ড করেন নি, তার জন্য কৈফিয়ত তলব করেন। সঙ্গে সঙ্গে এখনই লোকটাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে, আজকের মধ্যে তদন্ড় শেষ করে রিপোর্ট দাখিল করতে আদেশ দেন।

তাঁর এ-মূর্তি দেখে ভীত দারোগা তাঁর আদেশ পালন করে যে রিপোর্ট দেয়, তার ভিত্তিতে তিনি তিন চারজন আসামিকে তলব করে আনেন, এবং তাদের জামানতের দরখাস্ড় মঞ্জুর না-করে তাদের হাজত বাসের আদেশ দেন। এ মোকদ্দমায় তিনি এক ব্যক্তিকে তিন বছরের সশ্রম কারাদ- দিয়েছিলেন। তার এ রায় হাইকোর্ট পর্যন্ড় বহাল ছিল। কেবল এসব বিচার আচারেই নয়, তাঁর ইমানের জোর আরও নানাক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যখন আসাম সরকারের

ডি.এল.আর তখন ১৯৩৩-'৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড আর উইন দিলি- থেকে স্পেশাল ট্রেনযোগে আসামের সীমান্ড় তিনসুকিয়া পর্যন্ড় পরিদর্শন করা উপলক্ষে আগমন করেন। তখন গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন খান বাহাদুর তজম্মুল আলী সাহেব। ভাইসরয়কে আসামের গভর্নর, আসাম উপত্যকার কমিশনার জে হেজলেট ও গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিশনার তজম্মুল আলী সাহেব গোয়ালপাড়া রেলস্টেশনে সংবর্ধনা জ্ঞাপন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। গভর্নর জেনারেল স্টেশনে অবতীর্ণ হলে, সকলেই তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে নড বা মস্ড়ক অবনত করেন। খান বাহাদুর তজম্মুল আলী সাহেব তাঁর চিরাচরিত নীতির অনুসরণ করে, নড করেন নি। এ-ঘটনা ভাইসরয়ের মিলিটারি সেক্রেটারির দৃষ্টি এড়ায় নি। সে অবিলম্বে এ ধৃষ্টতা (?) আসাম উপত্যকার কমিশনারের নিকট পেশ করলে, ভাইসরয়কে বিদায় দিয়েই, কমিশনার এ-অভিযোগের ফাইল নিয়ে শিলঙে উপস্থিত হন। তখন স্যার মোহাম্মদ সা'আদউল- াহ আসাম সরকারের একসিকিউটিভ কাউন্সিলার ছিলেন। তাঁর কাছে এসে তিনি জানতে চাইলেন, কোন ব্যক্তিকে 'নড' করা কি ইসলামধর্মে নিষিদ্ধ। স্যার সা'আদউল- াহ তার উত্তরে বলেছিলেন—'যদি উপাস্য হিসেবে কেউ কোন ব্যক্তি বা বস্ড়ুকে 'নড' করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামধর্ম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে। তবে সম্মান প্রদর্শনের জন্য যদি 'নড' করে সম্মান প্রদর্শন করে তাহলে তা ধর্মের দৃষ্টিতে তেমন দূষণীয় নয়। এতে কমিশনার হেজলেট অত্যন্ড় রাগান্বিত হয়ে, খান বাহাদুর মফিজুর রহমানের নিকট গমন করে এ-সম্বন্ধে তাঁর মত জানতে চান। মফিজুর রহমান সাহেব স্পষ্ট বলে দেন, মুসলমান কোন কিছুকেই 'নড' করে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না। মুসলমানের 'নডের' একমাত্র বিষয় হচ্ছেন খুদ আল- াহ। এতে কমিশনার হেজলেট খুবই বিরক্ত হয়ে তার মন্ড়ব্য গভর্নরের নিকট প্রেরণ করেন এবং তজম্মুল আলী সাহেবের চাকরি বহাল থাকে। এসব বিষয় তজম্মুল আলী সাহেবের কর্ণগোচর হলে তিনি হেসে বলতেন—'নড' জীবনে কোনদিনই করি নি, এতে যদি চাকরি যায়, যাবে—তবে ইসলামধর্মের বিপরীত কোন নীতি পালন করতে পারবো না।

সেই মফিজুর রহমান সাহেবরই কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন জেনারেল ওসমানী। বংশ পরম্পরায় তাঁদের দেহে তাঁদের পূর্বপুর"ষ নিজামউদদীন ওসমানীর রক্ত থাকায়, ওসমানী শিশুকাল থেকেই ইসলামি ভাবধারার পরিবেশে গড়ে উঠেছিলেন। ওসমানীর নানা ছিলেন রায়কেলীর জমিদার মোহাম্মদ তাকিল চৌধুরী। ওসমানী ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ওসমানীর শিক্ষাজীবন শুর" হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আব্বা আসাম থেকে

পেনশন পেয়ে সিলেটে চলে এলে ওসমানী সিলেট সরকারি হাইস্কুলের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে গৌরবের সঙ্গে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রিটোরিয়া পুরস্কার লাভ করেন। অতঃপর তাঁর আব্বা তাঁকে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। সেখান থেকে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাস করে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিও লাভ করেন এবং এম.এ ক্লাসে ভর্তি হন। ইতোমধ্যে তিনি দিলি- তে অনুষ্ঠিত ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তবে সিভিল সার্ভিসে যোগদান না-করে, তিনি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন।

সেনাবাহিনীতে যোগদানের পরই শনৈঃ শনৈঃ তার উন্নতি হতে থাকে এবং মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি মেজর পদে উন্নীত হন। তিনি তখনকার দিনের ব্রিটিশ বাহিনীতে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ মেজর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বার্মা, ইরাক ও মিশরের আল-আলেমিন রণাঙ্গনে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের পর তিনি পাকিস্ড়ানে চলে আসেন এবং বহু সিনিয়র অফিসারকে ডিঙিয়ে কর্নেল পদে উন্নীত হন। তারপরে সেনা বিভাগের নানা দায়িত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর বির"দ্ধে একটা শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকারের জাহাজ চলাচল, অভ্যন্ড়রীণ নৌ ও বিমান চলাচল মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তিনি পুনরায় জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন ও মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্ড়াব গ্রহণ করে, বাকশাল চালু করার সময় তিনি সংসদ-সদস্যপদ ত্যাগ করেন। তারপরে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যার পর তখনকার দিনের পরিস্থিতিতে জেনারেল ওসমানী সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও দেশকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় জনতা পার্টি গঠন করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পরাজিত হওয়ার পর থেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

ওসমানীর সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও অনাবিলতা। যশ বা অর্থের লোভে তিনি কোনদিনই কোন কাজে হাত দেন নি। দেশের প্রতি অপরিসীম দরদের জন্য তিনি নানা সংকটপূর্ণ সৈন্য বিভাগের চাকরি গ্রহণ করে ছিলেন এবং আজীবন কৌমার্য ব্রত পালন করে দেশের সেবা তিনি করে গেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে সিলেটের সংস্কৃতি-সভ্যতার ইতিহাস পাওয়া যায় খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে এ গৌরবময় সংস্কৃতির দেশে যেসব মহামনা ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি

জন্মগ্রহণ করেছেন তার মধ্যে ওসমানী নিঃসন্দেহে আসন পাওয়ার যোগ্য। ধর্মের ক্ষেত্রে হজরত শাহজালালের আগমনের পরে কুতুব-উল-আউলিয়া বা হিন্দু সমাজের চৈতন্য দেব, জগন্মোহন গোস্বামী, রামকৃষ্ণ গোঁসাই, সন্ডু দাস (তারা কিশোর চৌধুরী) রাজনীতিক্ষেত্রে বিপিন পাল, সৈয়দ আবদুল মজিদ, সাহিত্যক্ষেত্রে সৈয়দ মুজতবা আলী, মরমি সাহিত্যে শেখ ভানু ও দেওয়ান হাসান রেজা যেভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তেমনই সক্রিয় রাজনীতিতেও জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী সেরূপ আসন লাভ করার উপযুক্ত পাত্র।
তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য বাংলাদেশের সর্বত্রই চেষ্টা হওয়া উচিত।

সূত্র : নাম তাঁর ইতিহাস

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯) : জাতীয় অধ্যাপক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক

আমার দেখা ওসমানী
মহিউদ্দিন শীর—

আজ এক জেনারেলকে কাছ থেকে দেখার কিছু কাহিনী বলতে চাই। সে কাহিনী শুধুই স্মৃতি। মুক্তিযুদ্ধের সফল অধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। ছোট ছোট কাহিনীর মধ্য দিয়েই বিচার করা যাবে এই অসাধারণ লোকটিকে। এসবের মাঝে ফুটে উঠেছে তাঁর দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক মন-মানসিকতা। তাঁর ধোপাদিঘির পূর্বপাড়স্থ বাসা আমার বাসা থেকে একশ' গজের ভিতরে। তাঁর গ্রামের বাড়িও আমাদের বাড়ির পাশে। ওসমানী সাহেব আমাকে দাদা বলে ডাকতেন। আমি লজ্জা পেতাম। সাদিকুর রহমান লখন ও আখতার আহমদ প্রমুখও আমাকে দাদা ডাকতেন। মুরব্বিয়ানরা শুনে কেউ কেউ অবাক হতেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের কথা। আমি তাঁকে প্রথম দেখি। তখন তিনি কর্নেল ওসমানী। তিনি আমাদের গ্রামের বাড়ি আসতেন এবং আমরা মিছিল দিতাম। তখন আমি ছাত্রলীগের কর্মী। তিনি নির্বাচনে প্রার্থী। বাংলাদেশের বৃহত্তম নির্বাচনী এলাকা থেকে দাঁড়িয়ে ওসমানী সাহেব বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মাওলানা নূরউদ্দিন শায়খুল হাদিস গহরপুরী। তারপর যুদ্ধ শুর— নয়মাস যুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীন হয়। জেনারেল ওসমানী কারো ওপর কোনো প্রতিশোধ নেন নি। তিনি তখন জাহাজ ও নৌ চলাচল মন্ত্রী। মন্ত্রী হয়ে তিনি তাজপুর-বালাগঞ্জ সড়কটি পাকা করান। তাজপুর কলেজ তাঁর নামে হবার কথা ছিল। এতে তিনি আপত্তি করেন এবং শেষপর্যন্ড় উদ্বোধনও করেন কলেজটির।

'এটা কানুন নয়' শব্দটি তাঁর একান্ড় নিজের। একবার নওশাদ চৌধুরীর সাথে রিকশায় যাচ্ছেন দরগায়। হাওয়াপাড়ায় এক রিকশা তাঁদের রিকশাটাকে ওভারটেক করে। সাথে সাথে রিকশার হুড ফেলে দেন এবং রিকশাওয়ালাকে বলেন—'এটা কানুন নয়।' রিকশাওয়ালা তাঁকে চিনেছে কিনা কে জানে। আর চিনবেই-বা কী করে। একজন জেনারেল এভাবে রিকশায় যায়! তা-ও বাংলাদেশে।

স্বাধীনতার পর আমাদের গ্রামের বাড়ি জামালপুরে আসেন ওসমানী সাহেব। আমাদের গ্রামে তাঁর ফুফুর বাড়ি। সকালে নাস্ড়া শেষে হঠাৎ বলেন, আমি বদরপুর যাবো, গ্রামটি কোন দিকে? হঠাৎ বদরপুর শুনে ইতস্ড়ত করতে লাগলেন কেউ কেউ। তিনি বললেন, আমি বদরী সাহেবকে কথা দিয়েছি, তাঁর বাড়িতে যাবো। তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেটা ছিল (মরহুম) আবিদুর রহমান বদরীর বাড়ি। বদরী আজ আর নেই। কিন্ড়ু সে দিন ওসমানী সাহেব তাঁর বাড়িতে যান।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় তিনি জাতীয় জনতা পার্টি গঠন করেন। জাতীয় জনতা পার্টির নেতা আশ্চর্যের ব্যাপার! আমাকে কোনোদিন তাঁর দলে যাওয়ার কথা তিনি বলেন নি। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর বাসায় যাওয়া আসা ছিল নিয়মিত। নওশাদ যখনই আসতো তখনই তাঁর বাসায় যেতাম। অ্যাডভোকেট নজমুলও থাকত সেই সময়। ক্যারাম খেলা ছিল আমাদের কাজ। আর শীতের দিনে ব্যাডমিন্টন। বালাগঞ্জের ফারুক ভাই ও আফতাব ভাই তখন তাঁর বাসায় থাকতেন।

প্রায় প্রতি শুক্রবারে যখন সিলেট থাকতেন, তখন তিনি জুম্মার নামাজ পড়তেন আমাদের নাইওরপুলস্থ মসজিদে। তিনি একজন অতিসাধারণ মানুষের মতো যাওয়া আসা করতেন। নামাজ শেষে আসার সময় আমাদের নাইওরপুলের 'চাচাজী' তাঁকে এগিয়ে দিতেন। চাচাজী মানে গদাই বক্স, তাঁকে এগিয়ে দিতে দিতে বলতেন, 'কান্দায় কান্দায় যাইবা।' 'গাড়ি ঘোড়ার ঠিক নাই।' চাচাজীর সেই কথা আজও ভুলি নি।

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী এবং তাঁর ভাই আসতো প্রায়ই। মাঝে মাঝে তাঁর মুড ভালো থাকলে এবং কোনো প্রশ্ন করলে বিশেষত আর্মির শাসন প্রসঙ্গে। এরশাদ সাহেবের সময় তখন। এ-সংক্রান্ড় প্রশ্নের জবাব দিতেন না তিনি, বলতেন তিনি উর্দি পরে ক্ষমতায় আসবেন কেন? এটা ঠিক নয়। আর কোনো প্রশ্ন করলেই তার জবাব ছিল— আমার ভাইয়ের মধ্যে পাবেন এসবের জবাব। অথচ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ এই বইটি আজও প্রকাশ হয় নি। এর জন্য দায়ী কে?

একবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তিনি প্রার্থী। সকাল ন'টার সময় বাসায় গেছি। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি সাংবাদিক? আমাকে তাড়াতাড়ি লাইন দিতে বলেন। আমি এক ঘণ্টা আগে লাইন দিতে বলে দেখুন এখনো দেয় নি। মনে মনে বললাম,আমি যে সাংবাদিক তা বুঝি! আপনাকে এক ঘণ্টা সময় লাইনে কেন লাইন দিতে? আমি টেলিফোন হাতে নিয়ে বললাম এই নাম্বার থেকে একটি কল বুক করা আছে, একটু আগে। জানেন কে কথা বলবেন? মুক্তিযুদ্ধের জেনারেল এবং প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেনারেল ওসমানী। বিনীতভাবে বললো তিনি এসব কিছুই বলেন নি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি লাইন দিচ্ছি। ওসমানী সাহেব আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে একবার কতিপয় পাকসেনা তাঁর বাসায় আগুন দেয়। ওরা বলছিল ওল্ড়াদ কা মোকাম, হুকুম তামিল করবো কিন্ড়ু কোনোরোকমে। সেই আগুনে বাসার কোনো ক্ষতি হয় নি। তাঁর গাড়ির ড্রাইভার মিয়া কথাগুলো আমাকে বলেছেন।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আমি সাংবাদিকতায় এম এ পাস করি। এ সময় বঙ্গবীর স্পোর্টিং ক্লাবে আমার সৌজন্যে এক সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। সভাপতিত্ব করেন সিলেট বেতারের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক বেলাল মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট আবদুর রহিম। সভায় বক্তব্য রাখেন যুগভেরীর সহকারী সম্পাদক মাহবুবুর রহমান এবং নূরুজ্জামান মনি।

আখতার আহমদের বিয়ের দাওয়াত, জেনারেল ওসমানী যাবেন। বিয়েতে যেতে হবে সুরমা মেল ট্রেনে করে, জুড়িতে। আমরা কয়েকজন যাবো ওসমানী সাহেবের সাথে। ওসমানী সাহেব আমাকে বললেন সাড়ে সাতটায় আসবেন। সেই রাতে আমার ঘুম হয় নি তারপর দেখি সাড়ে সাতটায় ওসমানী সাহেবের গাড়ি এসে হাজির। সে বলল, ওসমানী সাহেব রেডি তারপর আমিও তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে পড়লাম।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ওসমানী সাহেব গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট মনোনীত প্রার্থী। ওই নির্বাচনে ওসমানী সাহেবের নয়, লাভ হয়েছে আওয়ামী লীগের। সেই নির্বাচনে ওসমানী সাহেবকে ঐক্যজোটের প্রার্থী করে জনসমক্ষে আসে আওয়ামী লীগ। ওসমানীও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। এ যেন ওসমানী সাহেবের ঋণ স্বীকার। ১৯৭০-পূর্ব সময় আওয়ামী লীগ তাঁকে দলে এনেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কও করেছিল। এই সর্বাধিনায়কের দৃঢ় এবং সফল নেতৃত্বে আজ আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি।

মহিউদ্দিন শীরু (১.....): কবি ও সাংবাদিক

জেনারেল ওসমানী : দূর থেকে দেখা

মোস্ড়াফা শহীদ

বিদ্যা-বুদ্ধি, বয়স-অভিজ্ঞতা, আভিজাত্য ও কৌলীন্যে কোন সমতা ছিল না। ছিল না পরিচয় কিংবা যোগাযোগের বিন্দুমাত্র যোগসূত্র। তথাপি রাজপথ ধরে চলতে থাকলে অনেক সময় রাজার সহযাত্রী হবার সৌভাগ্য যেমন হয়ে যায় তেমনই সৌভাগ্য হয়েছিল জেনারেল ওসমানীর সাথে আমার পথ পরিক্রমার। হাজারো লোকের ভিড়ে অনেক সময়ই তাঁর পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, দৌড়ে কাছে যাবার চেষ্টা করলেও অনেক সময়ই কাছে ভিড়তে পারি নি। মিছিলের ঢেউ এসে দূরে ভাসিয়ে দিয়েছে। উদ্দীপ্ত সূর্যের তাপ যতটুকু অনুভব করেছি তার রশ্মি অবলোকনের সুযোগ ততটুকু পাই নি। মেঘ অবগুণ্ঠনের ফাঁকে ফাঁকে তাই তাকিয়ে দেখেছি ধোঁয়াটে চোখের ঔৎসুক্য নিয়ে। এ দেখা পরিপূর্ণতায় সমাপ্ত নয়। ভগ্নাংশের আংশিকতায় অসম্পূর্ণ।

লৌহকঠিন ওসমানীর রাজনীতিতে আগমন বঙ্গবন্ধুর চুম্বকীয় আকর্ষণের মায়াবী ফসল। বাঙালি, ছয়দফা, স্বদেশ ও স্বাধীনতা ওসমানীর কাছে নির্মম সত্য ছিল। দীর্ঘদিন পাকিস্ড়ানি ফৌজে চাকরি করে তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝে ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ কেন প্রয়োজন। পদ্মা মেঘনা যমুনার পানি কেন একাকার হয় না পাক সার জমিন সাদ বাদে।

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের আগ্নেয়গিরির লাভাস্মৃতি বাংলার মাটিতে তাই তার আগমন ধূমকেতুর মতো শুধু উজ্জ্বল আলোর ঝিলিক নিয়ে। বুকভরা জ্বালা নিয়ে ওসমানী তাই আমার কাছে কীর্তিতে ভাস্বর কোন মহাপুর"ষ নন—কর্মে উজ্জ্বল ক্লান্ড় এক সেনাপতি—যুদ্ধ জয়ের গৌরব যাঁর মহিমার কাছে বিবর্ণ হয়ে আছে।

হবিগঞ্জ থেকে জরাজীর্ণ কয়টি বগি নিয়ে একটি লোকাল ট্রেন সিলেটে যাতায়াত করতো ষাটের দশকে। উনসত্তরের এক সন্ধ্যায় সেই সিলেট যাচ্ছিলাম দলীয় সভায় যোগদানের জন্য। ফেঞ্চুগঞ্জ স্টেশনে এসে ট্রেনটি দাঁড়াবার পর প- ্যাটফরমের বিরাট হইচই শুনে জানালা দিয়ে মাথা বের করলাম। লোকারণ্য প- ্যাটফরম জয়বাংলা ধ্বনিতে মুখর। ওসমানী সাহেব মিটিং শেষে ট্রেনে সিলেট ফিরবেন। এলাকার জনসাধারণ তাঁকে তুলে দেবার জন্য স্টেশনে এসেছেন। আমাদের বগির দরজা বিরাট ধাক্কায় খুলে গেলো। কয়েকজন কর্মী দুইটা মাইক্রোফোনের চোঙা এম্পলিফায়ার তার ব্যাটারিসহ টেনে গাড়িতে তুললেন। মুহূর্তে উৎসাহী কর্মীর হইহল- ায় সব কিছু ল"ভ" হয়ে গেলো। আমরা কোনক্রমে কামরার এক কোণে সংকোচিত হয়ে বসলাম। গাড়ির সিটি বাজবার পূর্ব মুহূর্তে হেন্ডেলধরে দরজা দিয়ে ঢুকলেন পায়জামা পাঞ্জাবি পরিহিত

ছোটখাট একজন মানুষ। মাথায় টুপি গায়ে চাদর জড়ানো। চোখের তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিচে পক্ক কেশের বাহারি গোঁফ। সচরাচর চোখে পড়ে না এ-জাতীয় চেহারা। সবাই তাঁর বসবার জায়গা করার জন্য উদগ্রীব কিন্তু তিনি ঝুলানো বাঙ্কারের শিকল ধরে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন। ইশারায় সবাইকে চুপ থাকতে বললেন। কারও অসুবিধা হোক তা তিনি চান না।

কামরার ম্রিয়মাণ আলোর ধুপছায়ায় ওসমানী সাহেবকে দেখলাম। হইচই ও উশৃঙ্খলতায় তিনি বিব্রত হলেও জনসাধারণের হরষিত উৎফুলে- আনন্দিত। অনুভব করলাম ইচ্ছা করেই তিনি এখানে উঠেছেন জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশের জন্য। পাশে বসা মৌলানা আসাদ আলীকে কানে কানে বললাম, 'মনে বুর্ৎ তনে বুর্ৎ বুর্ৎ সনাক্তদার' সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করলাম সৈয়দ মুজতবা আলীর তরজমা 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি তা দেখে চেনা যায় না'। দেখুন ওসমানী সাহেবের গোঁফ কিন্তু তা ছাড়াই চেনা যায়। বিস্ফোরিত দৃষ্টির হতবাক চাহনি দিয়ে ওসমানী সাহেবকে প্রথম দেখলাম উদগ্র কৌতূহল নিয়ে। কামরায় অনেকের দিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি চোখের ইশারায় ও হাততুলে কুশল বিনিময় করছিলেন। ঘুরেফিরে তাঁর ছবি হঠাৎ আমার চোখে নিবদ্ধ হলো। মনে হলো দূরবীক্ষণের সুদূর সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তিনি আমাকে সম্মোহিত করেছেন। আমি হাত তুললাম তিনিও হাত তুললেন। চলন্ত ট্রেনের একগুঁয়ে আওয়াজ আর কামরায় চাপা কোলাহলের মাঝে তাঁর সাথে এই আমার প্রথম পরিচয়।

সিলেটের সভায় দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন ওসমানী সাহেবকে। সবাই জানলো বৃহত্তর সিলেটে তাঁর গ্রামের এলাকা থেকে তিনি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী একজন প্রবীণ সেনাকর্মী হিসাবে। বাঙালির স্বাধিকার আদায়ে আগামী দিনে হয়তো বন্দুক হাতে নিতে হতে পারে। তাই সেনানায়কের প্রয়োজন। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে বঙ্গবন্ধু মনোনয়ন দিয়েছেন সর্বাধিনায়কের। ব্যালটের যুদ্ধপরাজয়ের পর যদি বুলেটের যুদ্ধ আসে তখন যেন যোগ্য লোকের মুখ থেকেই আত্মাহুতির নির্দেশ উচ্চারিত হয়। সাত্ত্বিক, ন্যায়বান, কঠোর ও কুশলী ওসমানীকে তাই তিনি পাশে রাখতে চান সহকর্মী হিসাবে নয়, বিশ্বস্ত সহচর হিসাবে।

নির্বাচনের পর রেসকোর্স ময়দানে নৌকার আঙ্গিকে তৈরি বিশাল মঞ্চে ওসমানী সাহেবের সাথে আমার দ্বিতীয় দেখা। সেদিন ছিল ছয় দফার অঙ্গীকারে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণের দিন। লোকারণ্য জনসমুদ্রের সামনে মঞ্চে উপবিষ্ট জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদ্য নির্বাচিত সদস্যরা উপবিষ্ট। মাটি ও মানুষের নামে তারা শপথ নিবেন আল- ার কাছে, যদি ডাক আসে তবে বজ্রনলে হৃদয়ের দীপশিখা জ্বালিয়ে তারা উৎসর্গ করবেন অনাগত শত্রুকে।

নিজের বর্তমানকে তারা মোকাবিলা করবেন জাতির রঙিন ভবিষ্যতের জন্য। বঙ্গবন্ধুর জলদগম্ভীর ভাষণের পর সদস্যরা উঠে দাঁড়ালেন। মুহুর্মুহু করতালির মাঝে উচ্চারিত হল শপথ বাণী। ওসমানী সাহেব ফাঁকে ফাঁকে সদস্যদের চোখের দিকে তাকাচ্ছেন মুখ তোলে। মনে হলো পূর্ব পরিচয়ের সূত্র স্মরণ করতে পারছেন না। নিজের পরিচয় দিলাম। আবেগ নিয়ে তিনি করমর্দন করলেন আন্ড়রিক অন্ড়রঙ্গতায়। মুখে বললেন, 'ইনশাল- াহ্ দেখা হবে।'

এর পরের দেখা জলপাইগুড়ির বাগডুগরায়। ইতোমধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। বাঙালির বেঁচে থাকার মুক্তিযুদ্ধ। আদেশ এসেছে, বন্দরের বন্ধনকাল শেষ। মা পিছনে কাঁদছে। প্রেয়সী দুয়ারে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে। নবীন যাত্রীদলের যুদ্ধযাত্রা শুর" হলো। তখনও কানে বাজছে, 'আমি যদি হুকুম দিবার না পারি তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ রইল যার কাছে যা আছে তাই দিয়ে শত্র"র মোকাবিলা করবে।' পুর"ষোত্তম সেই মহাপুর"ষের আদেশ শিরোধার্য করে যা কিছু সম্বল ছিল তা-ই নিয়ে সঙ্গীসাথিসহ পাড়ি দিলাম। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। ত্রিপুরায় ঝোপজঙ্গলে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। রাস্ড়াঘাটে হাজারো শরণার্থী, ক্ষুধা আর বার"দের সংমিশ্রণে বিপর্যস্ড় জীবন। এরই মাঝে একদিন এত্তেলা এলো পরদিন দশ ঘটিকায় আগরতলায় অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। গাইড এসে নিয়ে যাবে নির্দিষ্ট স্থানে। পৌঁছার পর পরই সোজা এয়ারপোর্ট। জাম্বু এয়ার লাইনের ভাড়া করা প্রাইভেট বিমানে আরোহণ করে দেখলাম সহযাত্রী সবাই পরিচিত। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে যাচ্ছেন অজানা ঠিকানায়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সংসদ অধিবেশন বসবে ভিনদেশে, তাই কঠোর গোপনীয়তা নিরাপত্তার জন্য।

ঘণ্টা তিনেক আকাশ যাত্রার পর পাহাড়ঘেরা ছোট্ট এক এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম। বিমানের দরজার কাছেই দাঁড়ানো বৃহৎ মিলিটারি লরি। গুনে গুনে সবাইকে লরিতে তুলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। যেখানে এসে নামলাম জায়গাটা একটি সেনানিবাস। পরে জেনে ছিলাম নাম বাগডুগরা। সৈন্যদের ব্যারাক থেকে সরিয়ে চারপায়া খাটিয়ায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাহিরের মাঠে বানানো প্যানডেলে অধিবেশন বসবে। বিকালের দিকে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এসে পৌঁছলেন। পর দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হলো। ভাষণ, আলোচনা, সমালোচনার পর সবাই বললেন, আমরা এখন যুদ্ধে আছি। প্রধান সেনাপতির কাছে থেকে আমরা যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চাই। ওসমানী সাহেবকে কিছু বলবার জন্য আহ্বান করা হোক। ওসমানী সাহেব কাছাকাছি থাকলেও সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর ধারণা তিনি সেনাধ্যক্ষ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করবেন গণপ্রতিনিধিরা, তিনি তা বাস্ড়বায়িত

করবেন। ব্রিটিশ আর্মির সামরিক দর্শনে তিনি বিশ্বাসী। চাকরিজীবীর জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ। তাঁকে বোঝানো হলো তিনিও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি, এটা মুক্তিযুদ্ধ; বিপ- বী সরকারের বিদ্রোহে স্বাভাবিক যুদ্ধের নিয়ম-নীতি চলে না। যুদ্ধের গোপনীয়তা রক্ষা ও রেখে ঢেকে কথা বললে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে, তাই তাঁকে প্রকাশ্য অধিবেশনে দাঁড়িয়ে তাঁর সুবিধা অসুবিধা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছু বলতেই হবে। অবশেষে তিনি এলেন। কিন্ডু এ আর এক ওসমানী। গোঁফ কেটে ফেলেছেন। পরনে গাঢ় ধূসর বর্ণের প্যান্ট ও ফুলহাতা হাওয়াই শার্ট। মাথায় একই রং-এর মিলিটারি ক্যাপ। রক্তিম চোখের চাহনি। বেঁটে ঋজু শরীরের চামড়া তামাটে। কৃশকায় অবয়ব দেখে মনে হলো তাঁর বয়স যেন কমে গেছে। শুদ্ধ বাংলা তিনি বলতে পারতেন না, কথায় খাঁটি সিলেটি টান এসে যেত বলে ইংরেজিতে ভাষণ দিলেন। শুদ্ধ উচ্চারণে তিনি অনেক কথাই বললেন। বললেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের কথা। প্রবাসী সরকারের দোষত্রুটির কথা। বিশ্বাস ও শৃঙ্খলার অভাবের জন্য দোষারোপ করলেন। সর্বশেষ আশার বাণী শুনালেন—ইনশাল- াহ জয় আমাদের অনিবার্য। এটেনশন হয়ে ডান হাতে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিম-লীকে স্যালুট দিয়ে মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ মগ্নতায় তাঁর কথা শুনলাম। ভাবছিলাম এ-সময় ওসমানী না থাকলে কি হতো? কবিগুর-র কথা মনে পড়ল, 'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।'

অক্টোবরের শেষদিকে সেনাসদর থেকে বার্তা এলো সেনাধ্যক্ষ পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গন পরিদর্শনে আসছেন। সেক্টর কমান্ডারের কার্যক্রম তদারক করবেন। আমি যেন তাঁর জন্য অপেক্ষা করি। ইতোমধ্যে আমার কর্মপরিধি বেড়েছে। সিভিল এফেয়ার্স এডভাইজার হিসাবে সেক্টর কমান্ডারদের সাথে বেসামরিক যোগানদারি করার সরকারি দায়িত্ব পড়েছে। এতদিন মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট, ইয়ুথ ক্যাম্প পরিচালনা ও শরণার্থীদের তদারকি করাই মুখ্য কাজ ছিল। এখন সেক্টর কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অপারেশনের বেসামরিক ব্যবস্থাপনাও দেখাশোনা করতে হয়। সর্বরোগ নিবারণী ওষুধের মতো পেট ব্যথা, মাথা ব্যথার দাওয়াই হয়ে এখন শল্যচিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হতে লাগলাম। প্রেম এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতি নেই। আদার ব্যাপারীকেও জাহাজের খবর রাখতে হয়।

বিভিন্ন সাব সেক্টর ঘুরে ওসমানী এলেন। পূর্ণ সামরিক কায়দায় সালাম গ্রহণ করে ডাকবাংলোর পূর্বপার্শ্বের কামরায় প্রবেশ করলেন। মনে হলো তিনি ক্লান্ড় ও ভারাক্রান্ড়। আশানুরূপ উদ্যোগ আয়োজনের অনুপস্থিতি তাঁকে ব্যথিত করেছে। চা পানের পর উপস্থিত সামরিক ব্যক্তিবর্গের সাথে বৈঠকে বসলেন। অধিকাংশই

জুনিয়র অফিসার। তিনি ভর্ৎসনার সুরে কিছুক্ষণ বক্তব্য রেখে তাদের কথা শুনতে চাইলেন। ইতোমধ্যে জেনেছি ওসমানী সাহেবের কনফারেন্স লম্বা হয়। একজন শুধু কথা বললেন বাকি সবাই নিশ্চুপ হয়ে তা শুনবে। কেউ দরজা খুলতে পারবে না, বাইরে যেতে পারবে না, অনাহূত কেউ উপস্থিত থাকতে পারবে না। সভাস্থলে বিন্দুমাত্র উৎপাত তাঁর অসহনীয়। ভ্যাপসা গরমের পড়ন্ড় বিকালে এই কনফারেন্সের মেয়াদকাল নিয়ে চিন্ড়ায় পড়লাম। পরিচিত দুএকজন চোখের ইশারায় এই অস্বস্ড়িকর অবস্থার অবসানের জন্য ইঙ্গিত জানালেন। সাহস করে কেউ কথা বলছেন না। অনুভব করলাম বরফ আমাকেই ভাঙতে হবে। তাঁর কানে কানে বললাম, খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, অনুমতি দিলে টেবিল লাগাতে বলি। তিনি প্রথমে কিছুটা বিরক্ত হলেও কী যেন চিন্ড়া করে অনুমতি দিলেন। পাশের কামরায় খাবার ব্যবস্থা ছিল। নিতান্ড় সাধারণ খাবার, ভাত, ভাজি, ডাল ও মুরগির ঝুল। তিনি নিজেই সভার বিরতি ঘোষণা করলেন—'নাও মাই বয়েজ লেট আস টেক আওয়ার ফুড' বলে উঠে দাঁড়ালেন। খাবার আয়োজন দেখে তিনি হাসলেন। বাঁশের তৈরি ধামায় ভাত। অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে ভাজি, তরকারি। দৈন্য পরিবেশনায় পরিচ্ছন্ন আহার তাঁর অতীত স্মৃতির রোমন্থন ঘটাল। হাতে পে- ট নিয়ে চামচ দিয়ে খেতে খেতে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বার্মা ফ্রন্টের গল্প শুর" করলেন, 'ইন দি ইয়ার ফরটি টু'। বুঝলাম তিনি নস্টালজিক হয়ে পড়ছেন। গুর"গম্ভীর পরিবেশ শেষ। সবাই তাই চাচ্ছিলেন তাঁর মেজাজ হালকা রাখবার। বললাম, স্যার বার্মা ফ্রন্টের আপনার ব্যাটম্যান বৃদ্ধ মুনছব আলী ও ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলের সেক্টর কমান্ডার হিসাবে কালেঙ্গা পাহাড়, বাঘ শিকারের সময় আপনার আরদালি নিয়ামত শরণার্থী হয়ে আসারাম বাড়ির ক্যাম্পে আছে। আমার কাছে প্রায়ই তারা আপনার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে, আপনাকে তারা দেখতে চায়।

'ইজ ইট, আমি তাদের দেখতে যাব'

বললাম, 'না তা হয় না, আমি তাদের এখানে আনিয়ে নিচ্ছি। 'কেন হয় না? দে আর মাই ওল্ড কম্পানিয়ন। আমার উচিত তাদের ঘরে গিয়ে দেখা করা। জানেন, মৃত্যুর মুখোমুখি মুহূর্তে তারা আমার সঙ্গে ছায়ার মতো ছিল।'

বললাম, তারা সীমান্ড়ের খুবই কাছে থাকে। জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। আপনার উপস্থিতির সংবাদ পাঞ্জাবিরা যদি পেয়ে যায়?

'দ্যাটস রাইট, তা হলে তাদের এখানে আনার ব্যবস্থা কর"ন।' আমি বললাম, 'তাই হবে আমি ব্যবস্থা করছি।'

উর্দিপরা রাশভারি কঠোর মানুষটি জাদুমন্ত্র বলে আবার যেন পায়জামা পাঞ্জাবি পরিহিত সোজা সরল সাধারণ মানুষে পরিবর্তিত হলেন। কনফারেন্সের ইতি

ঘটল, দোষত্রুটি সংশোধনের আশ্বাস দিয়ে অফিসারেরা বিদায় নিলেন। আমি গাড়ি পাঠালাম আসারাম বাড়ির দিকে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ওসমানী হাতলবিহীন কাঠের চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছেন। তাঁর পুরাতন ভৃত মুনছব আলী, নেয়ামতউল- া তাঁর স্মৃতির দুয়ার খুলে দিয়েছে। বিস্মৃতির অতলান্ড় অন্ধকার ভেদ করে তিনি ফিরে গেছেন তাঁর যৌবনে। একান্ড় সান্নিধ্যে এই প্রথম পেলাম তাঁকে। সহজসরল সিলেটি ভাষায় তিনি কথাবার্তা বললেন আমার সঙ্গে। একান্ড়ভাবে ব্যক্তিগত সব কথাবার্তা। তাঁর কৈশোর, যৌবনের কথা, বয়স ও পদমর্যাদার তফাত ভুলে গিয়ে বন্ধুত্বের বাৎসল্যে আবদ্ধ করলেন। অকপট সরলতায় বর্ণিত করলেন তাঁর অতৃপ্ত অতীত, অনিশ্চিত বর্তমান ও অনির্ধারিত ভবিষ্যতের কথা। একান্ড় আপন এই আলাপচারিতায় মনে হলো সমুদ্রসৈকতের উপল উপকূলের নুড়ি পাথর হয়ে আমি যেন সমুদ্র কলে- ালের কলরোল শুনছি। যার শুর" আছে, শেষ নেই।

আমি ও তৈয়বুর রহিম সাহেব গিয়েছিলাম মন্ত্রণালয়ে। ওসমানী সাহেব তখন ডাক ও তার মন্ত্রী। মুক্তিযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর মুক্তিফৌজ থেকে ওসমানী সাহেব বিদায় নিলেন। আবার ফিরে এলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনে। তাঁর গোঁফের বাহার পূর্বের জায়গায় ফিরে এসেছে। অদ্ভুত সময়ানুবর্তিতা তাঁর। ঘড়ির কাঁটায় তাঁর কার্যসূচি নির্ধারিত। দপ্তরের কাজকর্মে ন্যূনতম বিশৃঙ্খলার অবকাশ নেই। আমরা পূর্বে যোগাযোগ করে যাই নি তাই অপেক্ষা করতে হলো অভ্যর্থনা-কক্ষে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ফিরে আসবো ভাবছি এমন সময় দরজা খুলে নিজে এসে অফিস কক্ষে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনাদের বসিয়ে রাখলাম কারণ তা উচিত ছিল। স্বাধীন দেশে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতে হবে। তার মধ্যে প্রধান সময়ের সঠিক ব্যবহার ও শৃঙ্খলা।' লজ্জিত হলাম। জড়িত কণ্ঠে বললাম 'জর"রি কাজ'। 'এম.পি সাহেবদের কাজ সবার আগে। আমি স্টাফদের বলে রাখছি দিনের কার্যসূচিতে এম.পি সাহেবদের সাথে সাক্ষাৎ প্রথম। কারণ তাঁরা জনপ্রতিনিধি। তাঁরা নিজের জন্য আসেন না দেশের জন্য আসেন কিন্ড়ু তাঁদের জানিয়ে আসা উচিত। মন্ত্রীরা তা হলে পূর্বেই প্রস্ড়ুত থাকতে পারেন।' নিশ্চুপ থাকলাম। ওসমানী সাহেবের জীবনধারা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও নিজের বোকামির জন্য দুঃখ হলো। ঠিক দুটায় উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'চলুন বাসায়।' পিয়ন পূর্বেই দরজা খুলে রেখেছিল বের হতে হতে তাঁর নেমপে- টে এম. পি লেখা, অন্যান্য মন্ত্রী তা লিখেন না। 'তাঁরা ভুল করেন' বলিষ্ঠতার সঙ্গে জোর দিয়ে তিনি বললেন, 'আগে এম.পি পরে মন্ত্রী। এম.পি হলে মন্ত্রী হওয়া যায় কিন্ড়ু মন্ত্রী হলেই এম.পি হওয়া যায় না। ব্রিটেনে মন্ত্রীর চেয়ে এম.পি-এর মর্যাদা বেশি। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অনেক কিছুই শিখতে হবে'—একটানা কথা

বলে তিনি থামলেন। গণতন্ত্রের প্রতি এক আশ্চর্য আস্থা ছিল তাঁর। ব্রিটিশ গণতন্ত্র ও সভ্যতার প্রতি ছিলেন দুর্বল। আমাদের ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থায় ইংরেজদের গণতান্ত্রিক চিন্ড়া-চেতনা ও তাদের চারিত্রিক গুণাবলি প্রতিফলিত হোক সব সময়ই তিনি তা বলতেন এবং তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন আপস ছিল না। রাজনীতিতে অগণতান্ত্রিক কিছু ঘটতে গেলেই তিনি র"খে দাঁড়াতেন সিংহের থাবা ও সাপের ছোবল নিয়ে।

তাই দেখলাম নতুন গণভবনে—বঙ্গবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় বিপ- বের চিন্ড়াভাবনা করেছেন। শেরেবাংলা নগরে নব নির্মিত তাঁর সরকারি কার্যালয়ের নাম 'গণভবন'। সদ্য নির্মিত গণভবনের সম্মেলন-কক্ষে সভা বসেছে এম.পি'দের নিয়ে। গুর"ত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় সমুদয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। সভাপতির চেয়ারে গম্ভীর বঙ্গবন্ধু নিশ্চুপ। সবাই জানতেন গুর"ত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে। আশা নিরাশায় সকলের চিত্ত দোদুল্যমান। একে একে নেতৃবৃন্দ ভাষণ দিচ্ছেন। আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করছেন সম্ভাব্য পরিবর্তনের সুফল কুফল। কিন্ড়ু কেউ-ই বঙ্গবন্ধুর চিন্ড়া-চেতনা ও তাঁর পরিকল্পনার বাইরে যেতে রাজি নন। পাছে বঙ্গবন্ধু ব্যথিত হন তাই কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছেন না, মাগরিবের নামাজের পর ওসমানী দাঁড়ালেন। ইংরেজিতে তাঁর দ্বিতীয় ভাষণ শুনলাম। তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। তাঁর বক্তৃতায় কোন জড়তা নেই। নেই কোন অস্পষ্টতা। অকুতোভয় যা বিশ্বাস করেন তা-ই বললেন, আমরা পাথর হয়ে তা শুনলাম—'আমি যা বিশ্বাস করি যার জন্য রাজনীতিতে এসেছিলাম তা-ই আপনাদের সামনে বললাম, যদি এর কোন ব্যতিক্রম হয় তা হলে বঙ্গবন্ধু ও আপনাদের সামনে এই আমার শেষ ভাষণ' বলে বসে পড়লেন।

তারপর যা হবার তাই হলো—ওসমানী সাহেব পদত্যাগ করলেন।

রাজনীতির ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তনে আবার তিনি হলেন একলা পথের পথিক। মান, যশ, প্রতিপত্তি কোন কিছুই তাঁর বিশ্বাস ও চিন্ড়াভাবনাকে প্রভাবিত করতে পারলো না। নিজের জ্ঞান গরিমায় যা তিনি সত্য ও সঠিক বলে মনে করলেন তাকে দু'হাতে আকড়ে ধরে তিনি বানপ্রস্থে গেলেন। দূর থেকে আমরা তার প্রতিচ্ছবি দেখলাম।

আমি ওসমানী সাহেবের জীবনীকার নই। তাঁর দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনের অনেক কিছুই আমার অজানা, তাঁর ধ্যানধারণা বিবেক ও বিশ্বাসের সাথে আমার সংশ্রব খুবই কম তবু তাঁকে আমি দেখেছি চিনেছি ও বুঝেছি। আমি তাঁকে দেখেছি একজন যোদ্ধা হিসাবে, চিনেছি একজন মানুষ হিসাবে, বুঝেছি একজন সংসারত্যাগী বিবাগী হিসাবে; তাই অনেক কিছু হয়েও ওসমানী কোন কিছুই হতে পারেন নি।

ক্যান্টনমেন্টের তিন নম্বর স্ট্রিটের ছোট দোতালা বাড়ির একাংশ ভাড়া নিয়ে তিনি থাকতেন। দেশের, সিলেটের এবং ঢাকায় তাঁর বিষয় সম্পত্তির হিসাব তিনি নিজেও জানতেন না। পৈতৃকসূত্রে পাওয়া সুদৃশ্য ঘরবাড়ি জায়গা জমি সব কিছু দান করে রিক্ততার আভিজাত্য নিয়ে তিনি রাজনীতি করে গেছেন এদেশে, যে দেশে মানুষ রাজনীতি করে ঘরবাড়ি বানায়, জায়গা জমি কেনে।

সামাজিক এক অনুষ্ঠানের দাওয়াত নিয়ে তাঁর বাসায় গেলাম। দুই রুম ও একফালি বারান্দার ছোট বাসা। তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন, দুইটি বৃহৎ কুকুর বারান্দায় বাঁধা। ছেলেবয়সের একজন চাকর ফুট ফরমাশি করে। পাকঘরে বয়স্ক একজন বাবুর্চি, একটি খাট, একসেট মলিন সোফা, একটি স্টিলের আলমারি, দুটি বড় সুটকেস এই নিয়ে তাঁর সংসার, আমাকে দেখে খুশি হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। মাথায় বালিশ থেকে বের হওয়া তুলার চিহ্ন। সাথে খয়েরি রং-এর লম্বাহাতা জাম্পার। খুশি হয়ে দাওয়াত গ্রহণ করলেন। সামান্য কথাবার্তার পর উঠে আসার মুহূর্তে বললেন, আমাকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, সন্ধ্যার পর এদিকে বেবিটেক্সি পেতে অসুবিধা হয়। হতবাক হলাম। বাড়ি দান করে দিয়েছেন জানতাম কিন্তু ঢাকা নগরীতে চলবার মতো গাড়ি তাঁর নেই। আমার নীরবতার অর্থ তিনি বুঝতে পেরে বললেন, আমাদের গাড়ি আমি মাঝে মাঝে ব্যবহার করি কিন্তু কিছুদিন যাবৎ গাড়িটা গ্যারেজে; সংকোচবিহীন সোজা সরল কৈফিয়ত। বললাম, আমি নিজে এসে নিয়ে যাবো আপনি তৈরি থাকবেন।

আপনি সাতটা ত্রিশ মিনিটে এসে পৌঁছাবেন আমি আটটা পঁয়ত্রিশে ফিরে আসবো। বুঝলাম আকাশ থেকে খসে পড়া উল্কারপিণ্ড স্থানচ্যুত হলেও তার তাপ ও আলোর বিলুপ্তি হয় না। জীবনকে তিনি স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন। জীবিকার কোন তাগিদ তাঁর নেই। চাওয়া পাওয়ার কোন খেদও তাঁর নেই। মনে হলো সর্বত্যাগী এক বিবাগী সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাঁকে অপমান করছি। জীবনের চড়াই-উৎরাই-এ হাজার ভাঙা গড়ায় তিনি যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। তাঁকে তৈরি থাকবার কথা বলা শুধু অন্যায় নয় মারাত্মক অপরাধও।

সি.এম.এইচ-এর ভি.আই.পি রুমে অসুস্থ ওসমানী সাহেবকে দেখতে গেলাম আশরফ আলী সাহেবের সাথে। স্থবির পঙ্গু রাজনৈতিক পরিবেশে আমি তখন এক কর্মবিহীন যাযাবর। অনেকক্ষণ বসে আলাপ করলাম। তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ, তাঁর দেশ ও দেশের মানুষকে মূল্যায়ন করছেন। অনেক কিছু করার ছিল অথচ তাঁর কোন কিছুই করা হলো না! নেতৃবৃন্দের ভুল-ভ্রান্তির কারণে দেশের আজ এ-অবস্থা। এভাবে চলতে পারে না। বিষাক্ত পরিমণ্ডলের বিষবাষ্প থেকে আমাদের অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে ইত্যাদি।

উঠে আসার মুহূর্তে তাঁর সাথে হাত মিলালাম পা‍ুর শীর্ণ হাত উষ্ণ, শক্তই মনে হলো। চেহারা রোগকাতর হলেও আদর্শের জন্যে তা অমলিন। বললেন, ‘আবার আসবেন, ইনশাল-   াহ দেখা হবে।’

তাঁর সাথে আর আমার দেখা হয় নি।

মোস্ড়াফা শহীদ (১৯৩৬) : রাজনীতিবিদ, সাবেক সংসদ-সদস্য

ওসমানী, মুক্তিযুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলির পর্যালোচনা

মো. আব্দুল আজিজ

একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রিতে পাকিস্ড়ানি বাহিনীর হায়েনার দল যখন অবসরপ্রাপ্ত সাময়িক কর্মকর্তা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীকে তাঁর নিজ বাসভবনে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, তখন তিনি আত্মগোপন করেছিলেন নিউ ইস্কাটনের একটি ফাঁকা বাড়িতে। পাকিস্ড়ানি ট্যাঙ্ক আর পদাতিক বাহিনীর নাকের ডগায় চার রাত কাটিয়ে তিনি ২৯ মার্চ সে বাড়ি ছেড়ে বের হন। কিন্ড়ু পরিচয় গোপন করার স্বার্থে ছেঁটে ফেলেন তাঁর বিখ্যাত গোঁফ। পথিমধ্যে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যুদ্ধরত ব্যাটালিয়নের সাথে মিলিত হন কুমিল- া সীমান্ড়ে। ৪ এপ্রিল তৎকালীন সিলেট জেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যুদ্ধরত বিভিন্ন ইউনিট কমান্ডারগণ মিলিত হন প্রতিরোধ যুদ্ধের সমস্যাবলি আলোচনা ও সম্মিলিত কর্মপন্থা নির্বাচনের উদ্দেশে। এ-বৈঠকে ওসমানীসহ উপস্থিত ছিলেন লে.কর্নেল আবদুর রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর সফিউল- াহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর মমিন চৌধুরী প্রমুখ সেনানায়ক। তাঁরা অনুভব করেন রাজনীতিকদের নিয়ে অবিলম্বে একটি সরকার গঠনের আবশ্যকতা রয়েছে। 'কিন্ড়ু সরকার গঠনের জন্য অপেক্ষা না-করে বাস্ড়ব পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁরা সমস্ড় বিদ্রোহী ইউনিটের সমবায়ে সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা গঠন করেন এবং কর্নেল ওসমানীকে তা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন।'[১] অন্য কথায় উপস্থিত সেনানায়কগণ ওসমানীকে তাঁদের সর্বাধিনায়ক হিসাবে মনোনীত করেন। সুতরাং বলা চলে যে ঐতিহাসিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় ওসমানীর ওপর।

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করলে ওসমানীকে নিযুক্ত করা হয় বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর Commander in Cheif বা প্রধান সেনাপতি। কিন্ড়ু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এবং পরবর্তীকালেও দীর্ঘদিন ওসমানীর পদবি হিসাবে 'সর্বাধিনায়ক' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস ওসমানী দৃঢ়তার সাথে দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করেছেন। বয়সের ভার তাঁর কর্মোদ্যমকে ব্যাহত করতে পারে নি। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও মেজাজে তিনি ছিলেন একজন নির্ভেজাল সৈনিক। তাই সৈনিকসুলভ প্রথাগত নিয়মশৃঙ্খলাকে তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে খুবই গুর"ত্ব দিতেন। ব্রিটিশ

সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যে লালিত ওসমানী স্বীয় মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে অভ্যস্ড় ছিলেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন ভারতীয় সেনাসদর দফতরের মিলিটারি অপারেশনস-এর ডেপুটি ডাইরেক্টার মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ড় সিং। তিনি লিখেছেন, 'চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ওসমানী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। সংকটের সময় অন্যেরা যখন বিচলিত হয়ে পড়তো তখন তিনি প্রেরণার উৎস হিসাবে বিরাজমান ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি অস্থায়ী সরকারের শক্তির একটি স্ড়ম্ভ ছিলেন এবং সকল কর্মকাে তাঁর একাগ্রতা ছিল তুলনারহিত। মর্যাদার বিষয়ে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। ... চাইতেন একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা তাঁকে দেওয়া হোক।...তাঁর বক্তব্য তিনি নির্বাসিত হয়েছেন তাঁর দেশ থেকে কিন্ড়ু উৎসারিত হন নি। তাঁর দেশ সাহায্য চায়—ভিক্ষা নয়। যুদ্ধে তাঁর লোকেরা ব্যর্থ হয়েছে পরাজিত হয় নি। যদিও পদবিন্যাসে তিনি জুনিয়র, কিন্ড়ু মর্যাদার দিক থেকে ভারতীয় প্রতিপক্ষের চেয়ে খাটো নয়।'[২]

'ভারতীয় ইস্টার্ন আর্মির চিফ অভ স্টাফ লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব-এর দৃষ্টিতে পাকিস্ড়ানের নিয়মিত সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এই অফিসার ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সাথে আত্মিকভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। নিজেকে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিয়মতান্ত্রিক।... ওসমানীর আচরণ ছিল পুরোপুরি সৈনিকসুলভ। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন এই মানুষটি ছিলেন চূড়ান্ড় কষ্ট সহিষ্ণু।'[৩]

২.

আজীবন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ওসমানী তাঁর সুদীর্ঘ সৈনিকজীবনে সব সময় জাতীয় মর্যাদাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্বের ন্যায্য হিস্যা আদায়ে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। আর এসব করতে গিয়েই পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীতে তিনি নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সামরিক পদমর্যাদায় ওসমানী ছিলেন কর্নেল। মুজিবনগর সরকার (যুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকার এ-নামেই অভিহিত হতেন) তাঁকে সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি বা সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করলেও তাঁর সামরিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করেন নি। আর এজন্য ভারতীয় বাহিনীর উচ্চতর র‍্যাঙ্কের অফিসারদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সামরিক প্রটোকল অনুযায়ী তাঁকে বেকায়দায় পড়তে হতো। এ-ব্যাপরে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন

ছিলেন বলে বিষয়টি ছিল তাঁর জন্য বিব্রতকর। ভারতীয় বাহিনীর অফিসারগণও সংগত কারণেই তাঁকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখতেন।

ওসমানী ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন নানা কারণে। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের অজ্ঞাতসারে বাংলাদেশি তরুণদের নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তোলেন যা প্রথমে বি.এল.এফ বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স এবং পরে মুজিববাহিনী নামে পরিচিত লাভ করে। ‘গোড়া থেকেই মুজিববাহিনী বাংলাদেশ সরকার গঠনের তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচারণা চালিয়ে এসেছে যে তারা এ-সরকার স্বীকার করে না।’[৪]

মুজিববাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতো ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী ‘র’ এবং এর দায়িত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল উবান। ‘মুজিববাহিনী কর্তৃক ক্ষেত্রবিশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া, তাদের আনুগত্য পরিবর্তনের জন্য চাপ প্রয়োগ করা ও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে কেবল যে মুক্তিযুদ্ধকেই ভিতর থেকে দুর্বল করে ফেলা হচ্ছিল তা নয়, অধিকন্তু আশ্রয়দাতা সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও এক সন্দেহের আবহাওয়াকে উৎসাহিত করে তোলা হচ্ছিল।’[৫] ভারতীয় সরকারের প্রশ্রয়ে গঠিত ও পরিচালিত হওয়ায় তাজউদ্দিন মন্ত্রিসভা এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। সর্বাধিনায়ক ওসমানী এদের উচ্ছৃঙ্খল ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে ছিলেন অসন্তুষ্ট কিন্তু কিছুই করতে না পেরে সংগত কারণেই ক্ষুব্ধ। এজন্য এক পর্যায়ে তিনি পদত্যাগেরও হুমকি দিয়েছিলেন।[৬] একইভাবে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা বি এস এফ-এর রুস্তমজীও এর বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদমুখর কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা হয় নি। এ-প্রসঙ্গে আমীর উল ইসলাম যথার্থই মন্তব্য করেছেন, ‘জাতি যখন সম্পূর্ণভাবে একটি নেতৃত্বের পেছনে ঐক্যবদ্ধ ও আস্থাবান এখন যুবশক্তিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে বিছিন্ন করা বা বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের যেমন সহায়ক হয় নি, তেমনি পরে দেশ পুনর্গঠনের কাজেও অন্তরায় হিসাবে কাজ করেছে।’[৭]

মুজিববাহিনী সম্পর্কে আরও তথ্য জানিয়েছেন রফিকুল ইসলাম বীর-উত্তম। তিনি লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ সরকার, ক্ষমতাসীন দলের (আওয়ামী লীগ) সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমান্ডারগণ কেউ-ই এ-ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানতেন না। কী জন্য এ ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, বাংলাদেশের ভেতরে এসে তাদেরকে কী ধরনের কাজ করতে বলা হয়েছে এবং তারা যেসব অস্ত্র ও যোগাযোগ যন্ত্রপাতি সাথে নিয়ে আসছে ওই সমস্ত বিষয়ের কোন কিছুই আমাদের জানানো হতো না।... ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কর্মরত ভারতীয় অন্যান্য সংস্থা ও বাহিনীসমূহের সবাই বি.এল.এফ বাহিনীর গঠন এবং

এদের কার্যক্রমে অত্যন্ড় অসন্ড়ুষ্ট ছিলেন। কিন্ড়ু আমরা সবাই ছিলাম অত্যন্ড় অসহায়।[৮]

এছাড়া ওসমানীকে এড়িয়ে চলার প্রবণতাও কোনো কোনো কমান্ডারের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাদের বক্তব্য ছিল—সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিনায়ক হওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ তার মানসিক সীমাবদ্ধতার কথাও উলে- খ করেছেন। অথচ বাস্ড়ব ঘটনা ছিল এই যে, এ অফিসারদের সবাই ছিলেন পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর অত্যন্ড় জুনিয়র অফিসার যাদের বয়স ও অভিজ্ঞতা দুটোই ছিল কম। এ-প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম জানিয়েছেন, 'সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রতিযোগিতা তখন থেকেই শুর" হয়। সফিউল- াহ, জিয়া ও খালেদ—এ তিনজনের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বলে তিনি মনে করেন।'[৯]

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যেও ওসমানী সর্ম্পকে বিরূপ ধারণা ছিল বলে জানা যায়। তাজউদ্দিনের একান্ড় সচিব ড. ফার"ক আজিজ খান লিখেছেন, 'I got a feeling that Col Osmany was not appreciated very much by his Cabinet Colleagus'.[১০] অনুমান করা যায় এসব কারণেই হয়তো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ওসমানীর সামরিক র‍্যাঙ্ক উন্নীত করা হয় নি।

৩.

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুর"তে যারা একটু সিনিয়র অবস্থানে ছিলেন তারা সকলেই পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ওসমানী অধিকন্ড়ু ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। আমাদের সেনা অধিনায়কদের কারো বৈপ- বিক যুদ্ধ পরিচালনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। একই কথা রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পর্কে খাটে। সুতরাং তারা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই সেনাপ্রধান ওসমানীর সমালোচনা করেছেন। কিন্ড়ু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ কোনো কিছুর দিক দিয়েই তারা ওসমানীকে অতিক্রম করার যোগ্যতা ধারণ করতেন না। একথা অনস্বীকার্য যে ওসমানী বয়স্ক ছিলেন। কিন্ড়ু ভারতীয় বাহিনীর সেনাপ্রধান স্যাম মানেকশ-ও ছিলেন তাই এবং দুজনই ছিলেন সেনাবাহিনীতে প্রায় সমসাময়িক। দুর্ভাগ্যজনক কারণে ওসমানী আইয়ুব খানের কোপানলে পড়ে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অকালে অবসরগ্রহণে বাধ্য হন। কিন্ড়ু মানেকশ' যথারীতি পদোন্নতি লাভ করায় তখনও ছিলেন নিয়মিত বাহিনীর সদস্য আর সেনা নিয়মে ওসমানী সংরক্ষিত বাহিনীর সদস্য।

তবে একথা সত্য যে সেনাপ্রধানের সকল সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বতার কারণে সকল সময় সকলের নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে তাও আশা করা যায় না। আমাদের

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মানেকশ', লে. জেনারেল অরোরা ও লে.জেনারেল জেকবের মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে। এমনকি তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ড় ও সামরিক সিদ্ধান্ড় সব সময় সমান্ড়রাল গতিতে এগোয় নি। এসব মতানৈক্যের বহু দৃষ্টান্ড়ের উলে- খ পাওয়া যায় লে. জেনারেল জেকরের সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা বইতে। এ-ব্যাপারে পার্থক্য এই যে তারা ছিলেন স্বাধীন দেশের সেনানায়ক আর আমাদের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল ভিন্নতর। আমরা ছিলাম ভারতের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল এবং লড়াই করছিলাম স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। সিদ্ধান্ড় গ্রহণের একক এক্তিয়ার আমাদের ছিল না। এ-বিষয়টি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে।

মঈদুল হাসান উলে- খ করেছেন যে, ওসমানী ছিলেন সামরিক ব্যাপারে রাজনৈতিক হস্ড়ক্ষেপের সম্পূর্ণ বিরোধী—যদিও পুরো মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপারটিই ছিল রাজনৈতিক।[১১] এটা হতে পারে এজন্য যে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিকরণ তাঁর পছন্দ ছিল না। তদুপরি তখনকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে কোন্দল চলছিলো—তার প্রভাব যুদ্ধের ওপর পড়ুক তা ওসমানীর কাম্য ছিল না। ওসমানীকে সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন বলেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন তাঁকে সব সময় সমর্থন দিয়ে গেছেন।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধা দুই সেনানায়ক যথার্থভাবে সেনাপ্রধান হিসেবে ওসমানীর মূল্যায়ন করেছেন। মে. জেনারেল মু. ইবরাহিম বীরপ্রতীক লিখেছেন, 'ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে পেয়ে সকলেই আশ্বস্ড় হন। তিনি সোহাগ ও শাসন সমানভাবে করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একরোখা হলেও ত্বরিত সিদ্ধান্ড় গ্রহণে পটু ছিলেন। অত্যন্ড় চৌকস কিন্ড়ু মার্জিত এবং অফিসারসুলভভাবে চলা ফেরা করতেন।

... তার মুখোমুখি বিরোধিতা করার সাহস সমসাময়িক বা কনিষ্ঠদের মধ্যে খুব কম লোকেরই ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার তাঁকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দিতে পেরে বেঁচে যায়।'[১২]

অপর সেনাধ্যক্ষ লে. জেনারেল মীর শওকত আলী বীর-উত্তম ওসমানী সম্পর্কে অনেক প্রচলিত ভুল ধারণার নিরসন করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, 'সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে যে, জেনারেল ওসমানীকে আমাদের দেশ ঠিক যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেয় নি। অনেকে অনেক কথা বলতে পারেন যে তিনি সম্মুখ রণক্ষেত্রে যান নি। এ-সবই মিথ্যে কথা। একজন প্রধান সেনাপতি প্রত্যেক দিন সম্মুখ রণক্ষেত্র দেখতে যান না। তার যতটুকু যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, তিনি ততটুকু গিয়েছেন। জেনারেল ওসমানী সাহেব আমার সেক্টরে গিয়েছেন। প্রত্যেক সেক্টরেই কয়েকবার করে রণাঙ্গনের পুরো সম্মুখভাগ পর্যন্ড়

গিয়েছেন। তার কাজ ছিল পরিকল্পনা আর নির্দেশ প্রদান। সেটা তিনি করেছেন।...'

'জেনারেল ওসমানী সব সময় একজন যথার্থ সৈনিক হিসেবেই আচরণ করেছেন। তাঁর আচরণ যথার্থই একজন কমান্ডারের মতো ছিল। কাজেই তাঁর মেজাজ হয়তো অনেকেই সহ্য করতে পারেন নি। আমি বলতে পারি একজন নিয়মিত সৈনিকই জেনারেল ওসমানীর সাথে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু একজন বিশৃঙ্খল অফিসারের পক্ষে তাঁর সাথে কাজ করতে যাওয়া যথার্থই কঠিন ছিল।'

'জেনারেল ওসমানী ভারতীয় জেনারেলগণের সমকক্ষ ছিলেন এবং কারো কারো সিনিয়র ছিলেন। জেনারেল অরোরা যিনি ইস্টার্ন কমান্ডের সি.ইন.সি ছিলেন, তাঁর চাইতেও জেনারেল ওসমানী সিনিয়র ছিলেন এবং খুব সম্ভবত জেনারেল মানেকশ থেকে জুনিয়র ছিলেন। তিনি যদি না থাকতেন আমার মনে হয় না ভারতীয় বাহিনীর জেনারেলগণ আমাদের যেভাবে সাহায্য করেছেন সেভাবে সাহায্য করতেন।'[১৩]

৪.

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি কঠোর বাস্তবতার বিষয় ভুলে গেলে চলবে না। গোড়া থেকেই এ-যুদ্ধ সর্বতোভাবে ভারতনির্ভর হয়ে পড়ে। ভারত কেবল যে তার ভূমি ব্যবহার করে তার ছত্রছায়ার যুদ্ধ চালাতে বাংলাদেশ সরকারকে অনুমতি দিয়েছিলো তা নয়, বিভিন্ন সামরিক উপকরণ সরবরাহ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদানেরও ব্যবস্থা করেছিল। সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাও নিয়োগ করেছিল। আমাদের সেক্টর কমান্ডারগণ এদের মাধ্যমেই বাংলাদেশ বাহিনী হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ভারতের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা যার কোনো বিকল্প ছিল না—আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নানা সমস্যা ও বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছিল।

যুদ্ধকালীন সামরিক সরকারের স্বল্পতা ও ঘাটতি ওসমানীকে ভীষণ পীড়িত করতো। তার জনসংযোগ কর্মকর্তা ওসমানীকে ভীষণ পীড়িত করতো। তার জনসংযোগ কর্মকর্তা লিখেছেন, 'অস্ত্রের জন্য সেক্টর কমান্ডাররা চাপ দিলে তিনি ছুটে যেতেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের কাছে। শুনেছি জেনারেল ওসমানী অস্ত্রের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলে প্রধানমন্ত্রী বিব্রতবোধ করতেন। তিনি শুধু বলতেন যা অস্ত্র আছে তা দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ জোরদার করুন। ভারি অস্ত্রশস্ত্রের যখন দরকার হবে তখন আর কোনো অভাব হবে না।'[১৪]

মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র যোগানের ক্ষেত্রে ভারতের নিজস্ব কিছু বিচার-বিবেচনা কাজ করেছে বলে ধারণা করা যায়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও মণিপুরে বিদ্রোহীদের তৎপরতা চলছিল। এসব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের নকশালপন্থিদের, সশস্ত্র বিদ্রোহ। এমতাবস্থায় অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত না-হয়ে ভারতের পক্ষে অস্ত্র সরবরাহ সম্ভব ছিল না।

অধিকন্তু যে অস্ত্র পাওয়া যেত তার ব্যবহার নিয়েও অনেক সময় বিপত্তি ঘটতো। এ-ব্যাপারে মেজর রফিকুল ইসলাম বীর-উত্তম লিখেছেন, 'প্রতিটি সেক্টরে যেসব অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ চালানো যাচ্ছিলো সেগুলো ছিল বিভিন্ন মাপের এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের তৈরি। যুদ্ধ চলা অবস্থায় সৈন্যদের যখন ট্রেঞ্চ বা বাংকার পরিবর্তন করতে হচ্ছে বারবার; ওই ধরনের পরিস্থিতিতে কোন ট্রেঞ্চে সৈন্যের কী ধরনের অস্ত্র আছে এ-বিষয়ে সর্বশেষ নির্ভুল তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব ছিল না। আমরা অনেকবারই ক্রমশ অস্বস্তিড়কর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, যখন ফ্রন্ট লাইনে গোলাবারুদের সরবরাহ পাঠিয়ে পরে দেখতে পেয়েছি একই ট্রেঞ্চে দুজন সৈন্য দুই দেশের তৈরি দুমাপের ভিন্ন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে। এসব কারণে আমাদের পুরো সরবরাহ ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে।[১৫]

ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিও সব সময় মানসম্পন্ন হতো না। এ-প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী ভারত সরবরাহকৃত অকেজো ওয়ারলেস সেটের কারণে যোগাযোগে অসুবিধা ঘটায় কামালপুর যুদ্ধে ভীষণ, ক্ষয়ক্ষতির কথা তার *এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য* গ্রন্থে উলে- খ করেছেন।[১৬]

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল ও যুদ্ধ পরিচালনার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা ও ওসমানীর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। আর এটা হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা ভারতীয় কর্মকর্তারা তাদের নিজ স্বার্থের দিকটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংশি- ষ্ট সমস্যাকে বিচার করতেন। আর ওসমানীর বিচারে আমাদের স্বার্থই প্রাধান্য পেতো। এছাড়া ওসমানীকে যেকোনো কৌশলের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়াকেও বিবেচনায় রাখতে হতো। তাঁকে ভাবতে হতো স্বাধীনতা উত্তরকালীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথাও। সে কাজের জন্য নিয়মিত বাহিনী দরকার, গেরিলাবাহিনী দ্বারা তা সম্ভব নয়। এ দীর্ঘমেয়াদী চিন্তাভাবনা থেকেই হয়তো ওসমানী গেরিলাবাহিনীর সাথে সাথে নিয়মিত বাহিনী সংগঠনের ওপরও জোর দিতেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এ-ব্যাপারে ওসমানীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন না। ওসমানীর এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হয়তো মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং বলেছেন, 'ওসমানী নিজেকে বাংলাদেশের দ্যা গল মনে করতেন।'[১৭]

ওসমানী মুক্তিবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো পাকিস্ড়ানি কায়দায় গড়ে তুলেছিলেন বলে তাঁর সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্ড়ু নিজ কাজের সপক্ষে ওসমানীর বক্তব্য ছিলো, 'এই অর্গেনাইজেশন অনেক চিন্ড়া করে বিগত দশ বছরে শান্ড়ি ও যুদ্ধে পরীক্ষার ভিত্তিতে গড়া হয়েছিল। এর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংশি- ষ্ট ছিলাম, সেটা ভারতীয় অর্গেনাইজেশনের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র।... অন্যান্য দেশের ইনফ্যানট্রি ব্যাটালিয়নের যা সাধারণ অস্ত্র থাকে এখানে তাই ছিলো তবে ফায়ার পাওয়ারটা এই অর্গেনাইজেশনের কিছুটা বেশি।'[১৮]

'পাকিস্ড়ানিদের বয়ানে মুক্তিবাহিনী তৎপরতার দিকটি সঠিকভাবে ধরা পড়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে জুন ও জুলাই মাসে মুক্তিবাহিনী লড়াই করেছে মূলত সীমান্ড় অঞ্চলে, যেখানে তাদেরকে নৈতিক ও বস্ড়ুগত সহায়তা করার জন্য ভারতীয় বাহিনী আশেপাশে ছিল। সেই পর্যায়ে তাদের মূল সাফল্যের মধ্যে ছিল ছোটখাট কালভার্ট ও রেললাইন উড়িয়ে দেওয়া, গ্রেনেড দিয়ে আক্রমণ চালানো, ইত্যাদি। এর পরের দুই মাসে দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা তাদের প্রশিক্ষণ ও অপারেশনের পদ্ধতিতে উৎকর্ষতার পরিচয় দেয়। এ সময়ে তারা যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা ওত পেতে সামরিক কনভয়ের ওপর আক্রমণ থেকে থানা আক্রমণ প্রভৃতি কার্যসূচি চালাতে শুর" করে এবং তাদের অপারেশনের এলাকা ঢাকা পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত করে। তৃতীয় পর্যায়ে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে তারা সীমান্ড় ও দেশের অভ্যন্ড়রে প্রচ" চাপের সৃষ্টি করে। এ-পর্যায়ে তারা ভারতীয় সৈন্য ও আর্টিলারির সহায়তা লাভ করে গুর"ত্বপূর্ণ শহরগুলোতে পাকিস্ড়ানিদের ব্যতিব্যস্ড় করে তোলে। এ-সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ড়ে কিছু সেতুমুখ তৈরি করে যা পরবর্তীকালে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করে।'[১৯]

৫.

ওসমানীর জনসংযোগ কর্মকর্তা নজর"ল ইসলাম জানিয়েছেন যে, তিনি কখনও ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড প্রধান লে. জেনারেল অরোরা এবং বাংলাদেশের সেনাপ্রধানকে একত্রে মিলিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনার কোনো আলাপ আলোচনা করতে দেখেন নি। তাঁর মতে 'দুই বাহিনীপ্রধানের বৈঠকে মিলিত হওয়ার মাঝখানে সামরিক প্রটোকলগত এক বিশাল প্রাচীর বিদ্যমান ছিল।'[২০] কারণ আমাদের সামরিক প্রধানের র‍্যাঙ্ক কর্নেলের ওপরে ছিল না। একজন ভারতীয় কর্মকর্তা নাকি নজর"লকে বলে ছিলেন, 'তোমাদের সরকার তোমাদের চিফকে প্রমোশন দিয়ে আমাদের জেনারেলের সমপর্যায়ে নিয়ে এলেই তো যৌথ কমান্ডের দুই প্রধানের প্রটোকলগত দূরত্ব চুকে যায়।'[২১]

মুজিবনগর সরকার আমাদের সেনাপ্রধানের সামরিক প্রটোকলগত দিকটি সঠিকভাবে অনুধাবন করেন নি বলে ধারণা করা যায়। সামরিক দৃষ্টিতে গোটা বিষয়টি শৃঙ্খলার সাথে জড়িত এবং প্রটোকলের ব্যাপারটি গুর"ত্ব দেওয়া হয়। এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন ওসমানী যখন তিনি নজর"ল ইসলামকে বলেছিলেন, 'আমি দুঃখিত আমাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে আত্মমর্যাদার বড় অভাব।' তিনি আরও বলেছেন, 'প্রটোকল সম্পর্কে আমাদের লোকদের কোনো ধারণা নেই, তাই এ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি।'[২২]

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ড় পর্যায় শুর" হওয়ার আগে ভারত ও বাংলাদেশের সরকার প্রধানদের মধ্যে একটি যৌথ কমান্ড গঠনের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী যৌথ কমান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সাথে দ্বৈতভাবে ওসমানীর থাকার কথা। কিন্ড়ু বিষয়টি ভারতীয় বাহিনীর মনঃপূত ছিল না। শেষ পর্যন্ড় রাজনৈতিক হস্ড়ক্ষেপের ফলে তারা সেটি মেনে নেন।[২৩] এ সর্ম্পকে ভারতীয় কূটনীতিক জে এন দীক্ষিতের স্বীকারোক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দীক্ষিত লিখেছেন, 'It was clearly understood that once the operations started, the command and control would rest with the Indian Military Headquatrers at Delhi and Calcutta. The creation of a joint command was essentially a political status and sensitivities.'[২৪] অর্থাৎ এটি স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে একবার যুদ্ধ শুর" হয়ে গেলে কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ দুটোই দিলি- ও কলকাতাস্থ ভারতীয় সামরিক সদর দফতরের ওপর বর্তাবে। যৌথ কমান্ডের সৃষ্টি মূলত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল যার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মর্যাদা ও অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখানো হয়।

ভারতীয় ইস্টার্ন আর্মির চিফ অভ স্টাফ লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব জানিয়েছেন যে, 'সেপ্টেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনীর অপারেশনগুলো আগের তুলনায় অনেক সংগঠিত ও কার্যকর হতে শুর" করে এবং তা ক্রমশ তীব্রতা লাভ করে। এর ফলে পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর লোকদের মনোবল ভেঙে যেতে শুর" করে এবং তা ক্রমশ তীব্রতা লাভ করে।'[২৫] কূটনীতিক দীক্ষিত স্বীকার করেছেন, 'The quick and successful conclusion of the war in the estern theatre was possible because of the valuable role played by the Bangladeshi Freedom Fighters.'[২৬] অর্থাৎ পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধের দ্র"ত ও সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি সম্ভব হয়েছিল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য।

কিন্ড়ু দীক্ষিত ওসমানী ও ভারতীয় বাহিনী সম্পর্ক বিষয়ে একটি সত্যভাষণ করেছেন যা পরবর্তী ঘটনা পরম্পরে অনুধাবন করতে সহায়ক হবে। দীক্ষিত

লিখেছেন, "Relation between General Osmani and Senior military officials of India's Eastern Command were some what tense. Although in terms of the `Joint Command' operational responsibilities were vested in the Goc-in-c Eastern Command, General Osmani rightly wanted to be seen in an operational role in planning the war strategy, Prime Minister Tajuddin Ahmed's effort's to persuade him to function in tandem with the Indian commanders irritated him at times. Relation between Osmani and Indian Commanders remained prickly throughout the war."[২৭] ওসমানী ও ভারতীয় পূর্ব কমান্ডের জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা উত্তেজনাকর ছিল। যদিও যৌথ কমান্ডের শর্ত অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সেনাধ্যক্ষের ওপর বর্তায়, ওসমানী সংগত কারণেই যুদ্ধ পরিচালনায় কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার দাবি করতে পারতেন। ভারতীয় কমান্ডারদের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝে তিনি বিরক্ত হতেন। যুদ্ধের পুরো সময় ওসমানীর ও ভারতীয় কমান্ডারদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলে।

দীক্ষিতের শেষ বাক্যটি থেকে অনুমান করা যাবে যুদ্ধ শেষে পাকিস্ড়ানিদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ওসমানীর অনুপস্থিতির কারণ।

৬.

ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দফতর অবস্থিত ছিল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। একাত্তর খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর সকাল সোয়া ন'টায় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অভ স্টাফ লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব ভারতীয় সেনাধিনায়ক জেনারেল স্যাম মানেকশ'র নিকট থেকে প্রাপ্ত বার্তায় সেদিনই সন্ধ্যার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্ড়ানিদের আত্মসমর্পণের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার নির্দেশ পান।'[২৮] সে নির্দেশ অনুযায়ী জেনারেল জেকব ব্রিগেডিয়ার সেথনাকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে কে কে উপস্থিত থাকবেন সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে ঢাকা যাওয়ার জন্য প্রস্ড়ুত হন। তিনি বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী থেকে কর্নেল ওসমানী ও উইং কমান্ডার খন্দকার যেন উপস্থিত থাকেন সেটা নিশ্চিত করার কথাও বলে যান।[২৯]

অন্যদিকে জানা যায় যে, ১৬ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বাংলাদেশ সরকারকে জানানো হয় যে সেদিনই বিকেলের দিকে ঢাকায় পাকিস্ড়ানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করবেন তা নির্ধারণের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ খোঁজ করেন কর্নেল ওসমানীকে। এ পর্যায়ে সেদিনের ঘটনাবলির

নাটকীয় বর্ণনা দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারের 'চরমপত্র' খ্যাত ও তৎকালীন সরকারের প্রেস ও তথ্য বিভাগের পরিচালক এম আর আখতার মুকুল। *আমি বিজয় দেখেছি* গ্রন্থে তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ও কর্নেল ওসমানীর চূড়ান্ড় কথোপকথনের বর্ণনা প্রসঙ্গে উলে- খ করেছেন যে, সেদিন ঢাকায় যেতে আপত্তি জানিয়ে ওসমানী বলেছিলেন, 'No, no, Prime Minister, my life is precious, I can't go'[৩০] না, না, প্রধানমন্ত্রী, আমার জীবনের মূল্য অনেক বেশি। আমি যেতে পারি না। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী নাকি গ্র"প ক্যাপটেন এ কে খন্দকারকে ডেকে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে ঢাকা যেতে অনুরোধ করেন।

এম আর আখতার মুকুলের বর্ণনার অনুকরণে সেদিনের ঘটনাবলির প্রায় একই বর্ণনা দিয়েছেন মুজিবনগর সরকারের ভ্রাম্যমাণ কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে দাবিদার অ্যাডভোকেট নুর"ল কাদের তাঁর *দু'শো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* নামক গ্রন্থে। এ গ্রন্থটি বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি-কর্তৃক শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। নুর"ল কাদের লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির দুই অফিস কক্ষের মাঝামাঝি খোলা জায়গায় সে সময় অনেকের সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী ওই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ঢাকায় যেতে কিছুতেই রাজি হলেন না। কারণ তার আত্মসম্মানবোধ ছিল অসাধারণ। জেনারেল ওসমানী অকাট্য যুক্তি দেখালেন যে, যেখানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ভারতের সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল স্যাম মানেকশ যাচ্ছেন না, সেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীপ্রধান হিসাবে তিনিও যেতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সন্তুষ্ট চিত্তে প্রধান সেনাপতির ওই যুক্তি মেনে নিলেন।'[৩১]

উপরোলি- খিত দুজন লেখকই তদানীন্ড়ন মুজিবনগর সরকারের সাথে সংশি- ষ্ট ছিলেন এবং তাদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা দুজনই সেদিন কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির কথোপকথনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, যদিও ওসমানীর ঢাকা না যেতে চাওয়ার কারণ সম্পর্কে তাঁদের ভিন্ন মত রয়েছে। মুকুলের মতে ওসমানী প্রাণভয়ে ঢাকা যেতে রাজি হন নি আর কাদেরের মতে তিনি আত্মসম্মানবোধের কারণে যেতে সম্মত হন নি।

অপরপক্ষে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদানকারী গ্র"প ক্যাপটেন এ কে খন্দকার সেদিনের ঘটনার প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'কর্নেল ওসমানী তখন সীমান্ড়ের অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শনের জন্য সিলেটে ছিলেন। সুতরাং সেই অল্প সময়ে তাঁর সঙ্গে চেষ্টা করেও যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।'[৩২] আবার প্রধানমন্ত্রীর একান্ড় সচিব ড. ফার"ক আজিজ খান লিখেছেন

যে, ১৬ তারিখে সাড়ে বারোটার দিকে ফোর্ট উইলিয়াম-কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের সাথে লিয়াজো রক্ষার জন্য নিযুক্ত কর্নেল পি দাস তাকে জানান যে, সেদিন বিকেলেই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান হবে—একথা তিনি যেন প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেন। ফার"ক আজিজের বর্ণনায় প্রধানমন্ত্রী শান্ড়ভাবে খবরটি গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে কে সে অনুষ্ঠানে যাবেন এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে জানতে চায়, 'Where is Osmani?... I told him that Col. Osmani had gone out of Calcutta with Brig. Ujjal Gupta of the Indian Army and Lt. Col. Abdur Rab, the chief of staff of the Banladesh Army. They had flown on a helicopter towards Sylhet area and that's all we know about Col. Osmani.' ওসমানী কোথায়? ... আমি তাকে জানালাম যে ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত ও বাংলাদেশ বাহিনীর চিফ অভ স্টাফ লে. কর্নেল আবদুর রবকে সাথে নিয়ে তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন। তারা একটি হেলিকপটারে করে সিলেট অঞ্চলের দিকে গেছেন। কর্নেল ওসমানী-সম্পর্কে এতটুকুই আমাদের জানা। তখন প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'Let Gr. Capt. Khandker go with Gen. Aurora to represent Bangladesh Armed Forces.'[৩৩] বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে তাহলে গ্র"প ক্যাপটেন খন্দকার জেনারেল অরোরার সাথে যাক।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের বিশেষ উপদেষ্টা মঈনুল হাসানও লিখেছেন, 'বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী বিভিন্ন সমরাঙ্গণ সফর করার উদ্দেশে ১১ ডিসেম্বর থেকে কোলকাতায় অনুপস্থিত থাকায় পাকিস্ড়ানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি। বস্ড়ুত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্ড়ানি আক্রমণে তাঁর হেলিকপটারে ভূপাতিত হয় এবং তিনি ও তাঁর সহযাত্রীগণ অল্পের জন্য রক্ষা পান।'[৩৪] মুজিবনগর সরকারের সংস্থাপন সচিব মোহাম্মদ নুর"ল কাদের তাঁর *একাত্তর আমার* গ্রন্থে উলে- খ করেছেন, 'আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে জেনারেল ওসমানীর উপস্থিত না থাকা নিয়ে পরবর্তী সময় অনেক কথাই লেখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অনেক অসত্য তথ্যও আছে। আসলে ওই দিন তিনি কলকাতা ছিলেন না। এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাও সম্ভব হয় নি।'[৩৫]

এবার দেখা যাক ওসমানী নিজে এ সম্পর্কে কী বলেছেন। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, 'বেশ ক'দিন থেকেই আমি ময়নামতি রণাঙ্গনে ছিলাম এবং ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে আমি লে. জেনারেল স্বাগত সিংহের সাথে মধ্যাহ্নভোজন করি। ভোজের পর আমার যাবার কথা ছিল তদানীন্ড়ন লে. কর্নেল সফিউল- াহর অধিনায়কত্বে পরিচালিত এস ফোর্সকে রণাঙ্গনে পরিদর্শন করার জন্য। কিন্ড়ু জেনারেল স্বাগত সিং সেদিন এস ফোর্স পরিদর্শনে না-যাওয়ায়

অনুরোধ করেন এবং বলেন, পরিদর্শনে অসুবিধে হবে কারণ তারা (এস ফোর্স) অগ্রসর হচ্ছেন অর্থাৎ চলন্ড় অবস্থায়। আমি তখন সফরসূচি পরিবর্তন করে সিলেটে জেড ফোর্স পরিদর্শনে যাওয়ার সিদ্ধান্ড় নিই।'[৩৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর ওসমানী আদৌ কলকাতায় ছিলেন না এবং এম আর আখতার মুকুল ও অ্যাডভোকেট নুর"ল কাদের এ-ব্যাপারে সঠিক তথ্য অবহিত ছিলেন না। তাই কল্পনার আশ্রয় নিয়ে নাটকীয় বর্ণনার অবতারণা করেছেন। অথচ দুঃখজনক ব্যাপার হলো, মুকুলের বইখানা বহুল প্রচারিত এবং একটি প্রামাণ্য বই হিসাবে বিবেচিত এবং নুর"ল কাদেরের বই বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে।

এবার এ বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানা যাক। এ-ব্যাপারে লে. জেনারেল জেকব জানাচ্ছেন, 'আনুমানিক বিকেল সাড়ে ৪ টায় আর্মি কমান্ডার ও সফর সঙ্গীরা পাঁচটি এম.আই ৪ ও ৪টি অ্যালুয়েট হেলিকপটারের এক বহরে করে ঢাকায় পৌছান। নিয়াজী ও আমি তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে যাই। মিসেস অরোরাকে সাথে নিয়ে আর্মি কমান্ডার নেমে আসেন। আরও অবতরণ করেন এয়ার মার্শাল দেওয়ান, ভাইস অ্যাডমিরাল কৃষ্ণন, লে. জেনারেল স্বাগত সিং, চতুর্থ কোরের ডিভিশনাল কমান্ডার ও উইং কমান্ডার এ কে খন্দকার (তখন গ্র"প ক্যাপটেন লেখক)। ওসমানীকে অবশ্য দেখা গেলো না।...দুর্ভাগ্যবশত কর্নেল ওসমানী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তাঁর জন্য পাঠানো হেলিকপটার পথিমধ্যে শত্র"র গুলির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ড় হয় এবং সময়মতো সেটা মেরামত করে তোলা সম্ভব হয় নি। তাঁর অনুপস্থিতির ভুল ব্যাখ্যা করা হয় এবং পরবর্তীকালে তা অনেক সমস্যার জন্ম দেয়।'[৩৭]

উপরে উপস্থাপিত বর্ণনাসমূহের আলোকে নিম্নোলিখিত সিদ্ধান্ড়সমূহে উপনীত হওয়া যায় :

১. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে ওসমানী কলকাতা উপস্থিত ছিলেন না।

২. মুজিবনগর সরকার তাঁর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এবং যোগাযোগের সে রকম মাধ্যম তাদের না-থাকার এবং হাতে যথেষ্ট সময়ের অভাবে তাঁর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না।

৩. সঠিক খবর ভারতীয় সামরিক বাহিনীর জানা ছিল। ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে ওসমানী লে. জেনারেল স্বাগত সিং-এর সাথে মধ্যাহ্নভোজন করেন। কিন্ড়ু জেনারেল স্বাগত সিং ওসমানীকে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ সংক্রান্ড় বিষয়ে কিছুই জানান নি। ওসমানী লে. কর্নেল সফিউল- াহর অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনে যেতে চাইলে তাঁকে তিনি অন্য বাহানায় সিলেট অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। পরে বিকেলে তিনি নিজে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

৪. ব্রিগেডিয়ার সেথনাকে প্রদত্ত জেনারেল জেকবের নির্দেশ ছিল আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ওসমানীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার। সে নির্দেশ প্রতিপালিত হয় নি। এছাড়া জেকবের বর্ণনা অনুযায়ী ওসমানীকে আনার জন্য হেলিকপটার পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ওসমানী নিজেই জেনারেল স্বাগত সিং-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। হেলিকপটারটি দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা ছিল ওসমানীকে বহনকারী। এ হেলিকপটারটি সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিলেট অঞ্চলে গুলিবিদ্ধ হয়। সুতরাং জেকবের বর্ণনায় শেষাংশ সত্য গোপনের প্রচেষ্টা রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

৫. ইতঃপূর্বে উলি- খিত সাক্ষাৎকারে ওসমানী নিজে অভিযোগ করেছেন যে, 'ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের মহান ব্যক্তিবর্গ (স্ব স্ব কারণে বা উদ্দেশে) চাইতেন না যে এই আত্মসমর্পণ বাংলাদেশ তথা মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে হোক। যদিও মুক্তিবাহিনী (নিয়মিত ও অনিয়মিত) সুদীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ করেছিলো এবং তাদের সর্বাধিনায়ক কেবিনেট মন্ত্রী সমপর্যায়ের মর্যাদার অধিকারী ছিলাম।' এটি তাঁর অভিমানের উক্তি হলেও এর মধ্যে যে কিছু সত্যতা ছিল তা উলি- খিত ঘটনা পরম্পরা থেকে অনুমান করা যায়।

৬. কূটনীতিক দীক্ষিত সঠিকভাবেই জানিয়েছেন যে ওসমানীর সাথে ভারতীয় সমরবিদদের সম্পর্ক মধুর ছিল না। রাজনৈতিক কারণে কমান্ডে তাঁর অংশীদারিত্ব স্বীকার করে নিলেও তার বাস্ড়বে তাঁকে চূড়ান্ড় যুদ্ধে কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে চান নি। এছাড়া আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ওসমানী উপস্থিত থাকুন ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাদের এ অভিপ্রায়ে থাকলে স্বাগত সিং দুপুরবেলা তাঁকে এ-ব্যাপারে অবগত করতেন।

৭. মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের সার্বিক কৃতিত্ব ভারতীয় বাহিনী কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল। আর সে কারণেই আত্মসমর্পণের দলিলে শুধু ভারতীয় কমান্ডার ও পাকিস্ড়ানি কমান্ডারের স্বাক্ষরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এর ফলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ রূপ নেয় ভারত-পাকিস্ড়ান যুদ্ধে। বাংলাদেশকে বঞ্চিত করা হয় এক মহান গৌরবের অধিকার থেকে।

৮. জেকব লিখেছেন যে তিনি আত্মসমর্পণ দলিলের একটি খসড়া সদর দফতরে পাঠিয়ে ছিলেন। সে দলিল অনুমোদনের বিষয়ে মানেকশ-এর নিকট জানতে চেয়েও কোনো জবাব পান নি।'[৩৯] সে খসড়া কী ছিল আমরা জানি না। কিন্ড়ু এমন হওয়াও বিচিত্র ছিল না যে সেখানে ওসমানীকে যৌথ স্বাক্ষরকারীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কিন্ড়ু সেটি সদর দফতরের মনঃপূত ছিল না বলে মানেকশ এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকেন। পরে চূড়ান্ড় দলিলটি যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

৯. এ ঘটনায় বাংলাদেশের আত্মসম্মানবোধ যে আহত হয়েছিল ভারতীয় কূটনীতিক জে এন দীক্ষিত তা যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'A major political mistake at the surrender ceremony was the Indian military high command's failure to ensure the presence of General M.A.G Osmani, Commander from the Bangladesh side on the joint command at the ceremony and making him a siguntory... there was widespread suspicion that his helicopter had been sent astray so that he could not reach in time and the focus of altertion at the ceremony was rivetted on the Indian military commanders. This was an unfortunate aberration which Indian could have avoided.'[৪০]
আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে ভারতীয় সামরিক হাই কমান্ড যে একটি বড়ো রকমের রাজনৈতিক ভুল করেন তা হচ্ছে যৌথ কমান্ড বাংলাদেশের অধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে না-পারা এবং তাঁকে স্বাক্ষরকারীদের অন্তর্ভুক্ত না করা।...ব্যাপকভাবে সন্দেহ করা হয়েছিল যে তাঁর হেলিকপটারটিকে বিপথগামী করা হয় যাতে তিনি সময়মতো ঢাকা পৌঁছতে না পারেন এবং ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাদের প্রতি সকল মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এটি ছিল দুর্ভাগ্যজনক নীতি। বিচ্যুতি যা ভারত সহজেই পরিহার করতে পারতো।
ভারতীয় কূটনীতিন জে এন দীক্ষিতের এ স্বীকারোক্তিমূলক বিশে- ষণের পর এ বিষয়ে আর পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

তথ্যসংকেত

১. মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৫
২. মে.জে সুখওয়ান্ড় সিং, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, ভাষান্ড়র মাসুদুল হক, মীরা প্রকাশন, ২য় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ৩০
৩. লে.জে এফ আর জেকব, সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা, একটি জাতির জন্ম, অনু, আনিসুর রহমান মাহমুদ, ইউপি এল, ১৯৯৯, পৃ. ৩১
৪. মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
৫. তদেব, পৃ. ৮০
৬. তদেব
৭. আমীর উল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, কাগজ প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ.৬৬
৮. রফিকুল ইসলাম, বীর-উত্তম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, অনন্যা ২০০২, পৃ. ২৭৯
৯. আমীর উল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪
১০. Faruq Aziz Khan, Spring 1971, U.P.L, 1998, P 176
১১. মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
১২. মে.জে মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীরপ্রতীক, সেনাবাহিনীর অভ্যন্ড়রে আটাশ বছর, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ২১

১৩. শামসুল হুদা চৌধুরী, একাত্তরের রণাঙ্গন, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৯৬
১৪. নজরুল ইসলাম, একাত্তরের রণাঙ্গন অকথিত কিছু কথা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১২২
১৫. রফিকুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২-৩৩
১৬. মে.জে মইনুল হোসেন চৌধুরী, এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক, মওলা ব্রাদার্স, ২০০০, পৃ. ২১
১৭. মে.জে সুখওয়ান্ড় সিং, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
১৮. হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, অবরুদ্ধ সংবাদপত্র '৭১ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল, নসাস ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৩৬
১৯. সিদ্দিক মালিক, নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, নভেল, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১১০-১১
২০. নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
২১. তদেব
২২. তদেব, পৃ. ১২১
২৩. I. N. Dixit, Liberation and Beyond, Upl, Dhaka, 1999, P-87
২৪. তদেব, পৃ. ৮৮
২৫. লে. জে জেকব পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০
২৬. I.N. Dixit, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
২৭. তদেব, পৃ. ১০৩-০৪
২৮. লে. জে জেকব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩
২৯. তদেব, পৃ. ১১৪
৩০. এম আর আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ, ১৩৯১, পৃ. ৩০৮-০৯
৩১. নুরুল কাদের, দু'শো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, ঢাকা, ৭ম সংস্করণ, পৃ. ৩৩৯
৩২. বাংলাদেশের সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭
৩৩. Faruq Aziz Khan পূর্বোক্ত পৃ. ২৪৮
৩৪. মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬
৩৫. নুরুল কাদের, একাত্তর আমার, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১০৭
৩৬. হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮
৩৭. লে. জে জেকব পূর্বোক্ত পৃ. ১২০-২১
৩৮. হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, পূর্বোক্ত
৩৯. লে. জে জেকব, পূর্বোক্ত পৃ. ১১৩
৪০. I. N Dixit পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

মো. আব্দুল আজিজ (১৯৩৬) : প্রফেসর ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

ওসমানী বজ্রের মতো কঠোর, পুষ্পের মতো কোমল

মো. শফিকুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাঙালি জাতির ইতিহাস। এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও বঙ্গবীর ওসমানীর নাম বারবার না আসে। অবিতর্কিত জাতীয় নেতা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। বঙ্গবীর ছিলেন ন্যায়ের পক্ষে আপসহীন দৃঢ়চিত্ত এক মহাপুর"ষ। তিনি এমন এক ক্ষণজন্মা বিস্ময়কর চরিত্রের অধিকারী বিরল ব্যক্তিত্ব, যিনি নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে ছিলেন আপসহীন বজ্রের মতো কঠোর, অপরদিকে মানবতার দিক থেকে তিনি মানুষকে খুব বেশি ভালোবাসতেন এবং সে ব্যাপারে তাঁর হৃদয় ছিল পুষ্পের মতো কোমল।

পৃথিবীর ইতিহাসে এটা এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ড় যে, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হয়েও জেনারেল ওসমানী কোন সময়ই ক্ষমতা গ্রহণ করেন নি। বরং সকল লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থেকে আজীবন নির্ভেজাল গণতন্ত্রের সাধনা করে গেছেন। ওসমানী যে গণতন্ত্র চাইতেন তা শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতায় ভাগ বসানোর জন্য নয়। তিনি সব সময় চাইতেন সরকার জনগণ দ্বারা গঠিত হবে এবং জনগণের কাছে দায়ী থাকবে।

বঙ্গবীর ওসমানী কেবল একজন দুর্দান্ড় সাহসী সমরবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি জনদরদি রাজনীতিবিদ। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬ বছর বয়সে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এই ক্ষুদ্র পরিসরে নেতৃত্ব ছাড়াও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসাম বেঙ্গল ছাত্র সংঘের সহসভাপতি নির্বাচিত হওয়া এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে জহরলাল নেহর" কর্তৃক উদ্বোধনকৃত এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে লক্ষ্মৌর সার্ভেন্ট অভ ইন্ডিয়া সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান এবং সম্মেলনে বিষয় নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক কর্মকা"ের নেতৃত্ব দেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ প্রায় পঞ্চাশ বছরকালের সকল কর্মকা"ই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকা", যদিও ওই সময়ের প্রায় ২৮ বছর তিনি সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। ছাত্রনেতা হিসেবে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবীর ওসমানীর মনে যে চেতনার উদ্ভব হয়েছিল তারই প্রয়োজনে তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং সামরিক বাহিনীতে অবস্থানকালে তাঁর সকল কর্মকা" প্রমাণ করে যে, নিছক চাকরি অথবা সামরিক অফিসার হওয়ার জন্য নয়, বরং রাজনৈতিক কারণে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে ভবিষ্যতে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্যই

তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও জনতার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন বঙ্গবীর ওসমানীর মনকে নাড়া দিয়েছিল তারই প্রয়োজনে তিনি একদিকে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, অন্যদিকে একটি শক্তিশালী বাঙালি সেনাবাহিনী গঠনের কাজ হাতে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিদেশি বিজাতীয় শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে লড়তে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী। আর এ-কারণে তিনি নিজের পদোন্নতি বা সুযোগ-সুবিধা বর্জন করে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঙালি জাতির জন্য সতর্কতার সাথে অগ্রসর হন এবং তাঁর প্রচেষ্টায়ই পশ্চিমা শাসকদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয় এবং বাঙালি সৈনিক ও অফিসার গড়ে ওঠে, যারা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে সশস্ত্র নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বঙ্গবীর ওসমানীর স্বপ্ন ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। তিনি জীবনের শেষদিকে জাতীয় জনতা পার্টি গঠনের মাধ্যমে যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সময়ের আলোকে সর্বোত্তম। রাজনীতিকে তিনি গণনীতি মনে করতেন এবং বাংলাদেশের নিপীড়িত, বঞ্চিত, হতাশাগ্রস্ত জনগণকে স্বৈরশাসন ও শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বাস্তবতার আলোকে বিশে- ষণ করে গণনীতির রূপরেখা তুলে ধরেন, যা দেশে নতুন স্রোতধারার প্রবর্তন করে। তিনি বর্তমান প্রচলিত সে- াগানসর্বস্ব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পুরোনো ধারার প্রতি বিদ্রোহ করে সমাজ বিপ- বের নতুন পথের নিদর্শন দিয়েছেন। শুধু রূপরেখা প্রদানই নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মধ্যে যে বিবেকবর্জিত ব্যবসা, চতুরতা , কথা ও কাজে অমিল এবং আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা রয়েছে তার বির"দ্ধেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। নিজের সততা এবং কথা ও কাজে মিল রেখে সবকিছু উপেক্ষা করে দেশের স্বার্থকে সব সময় বড় করে দেখেছেন এবং অপরাধী যেই হোক তার বির"দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছেন। স্বাধীন দেশের রাজনীতিতে জাতীয় জনতা পার্টির কর্মকা"ে নেতৃত্ব দিয়ে দৃষ্টান্ত রেখেছেন যা সম্পদ ও শক্তিতে নির্ভরশীল সমাজভিত্তিক সমাজ গড়ার সংগ্রামীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। বিদেশের সাথে বন্ধুত্ব মানে দাসত্ব নয়, নেতৃত্ব মানে গরম বক্তৃতার আড়ালে ঠগবাজি নয়, সে কথা স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঙ্গবীর ওসমানীই বারবার দেখিয়ে দিয়েছেন।

বঙ্গবীর ওসমানীর সশস্ত্র নেতৃত্বে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন ওসমানী বেঁচে থাকলে খুবই কষ্ট পেতেন আজ তাদের এই কর"ণ অবস্থা দেখে। আজকে অদৃশ্য থেকে অদৃশ্যতর হয়ে যাচ্ছে সত্যিকারের মানুষ, যারা রক্ত দিয়েছে, যুদ্ধ করেছে এ-দেশের স্বাধীনতার জন্যে। তাদের পুনর্বাসন এবং এ-দেশের তর"ণ যুবকদের

মধ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ ও মানসিকতা তৈরি করার জন্য ওসমানীর মতো নেতৃত্বের বড় বেশি প্রয়োজন ছিল। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সকলকে একত্রিত করে স্বাধীনতা অর্জন করে প্রমাণ করেছেন বাঙালি জাতি বীরের জাতি, এ-দেশের যুবকরা মাতৃভূমির প্রতি অকুতোভয় সৈনিক। ইতিহাসই তার প্রমাণ বহন করে। এজন্য বাঙালি জাতি চিরদিন বঙ্গবীর ওসমানীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি জাতি থাকবে, ততদিন ওসমানী বারবার আমাদের মানসপটেই বেঁচে থাকবেন।

বঙ্গবীর ওসমানী সার্বভৌম সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, তাই তাঁকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর যে অবিচল আস্থা ও শ্রদ্ধা তা কোন সামরিক প্রধানের মধ্যে এরূপ থাকতে পারে, তা কল্পনাই করা যায় না। তিনি সদাসর্বদা অবিচল থেকেছেন গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য। আজকের সমাজব্যবস্থায় নামমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্র থাকলেও তা কেবল মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী বিশেষের গণতন্ত্র। সত্যিকার গণতন্ত্র এখনও আমরা পাই নি। আজকে গণতন্ত্রের নামে সমাজে মাস্ড়ান তৈরি করা হচ্ছে, কোমলমতি ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে, যুবসমাজকে হেরোইন আসক্ত করা হচ্ছে, ধর্মের নামে ধর্মব্যবসা চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজ বাংলাদেশের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা চলছে, দেশের মানুষকে কঠিন সমস্যার ভিতর দিয়ে দিন যাপন করতে হচ্ছে। আজকে শিল্প-কারখানা একটার পর একটা সুকৌশলে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে একটি বিশেষ গোষ্ঠী বিদেশি মদদপুষ্ট সরকার এবং এ-দেশের চোরাকারবারি কালোবাজারিরা সমস্ড় জাতিকে জিম্মি করে রেখেছে। আজ সমগ্র জাতি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে ওসমানীর মতো একজন ব্যক্তি বেঁচে থাকলে কঠিনভাবে এর প্রতিবাদ হতো, প্রতিরোধ হতো, জনগণ আবার জেগে উঠতো।

আমাদের তর"ণ ও কিশোরদের মধ্যে ওসমানীকে আমরা যদি প্রত্যক্ষভাবে নিয়ে যেতে পারি তাহলে তারা কাজে-কর্মে, চিন্ড়ায়-ভাবনায় ওসমানীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে ওসমানীর মতো গড়ে উঠবে। তাই বঙ্গবীর ওসমানীর গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি, গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি এবং দেশপ্রেমের প্রতিটি আচরণসহ তাঁর জীবনের অবদান ও আদর্শ প্রবন্ধে, কবিতায় ও গল্পে আমাদের শিশু-কিশোর ও তর"ণদের মধ্যে তুলে ধরার জন্য সকল শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে অন্ড়র্ভুক্ত করা দরকার। সকল প্রকার লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে নিঃস্বার্থ এই মহান দেশপ্রেমিক জাতীয় নেতা মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এবং পিতা-মাতার সকল সম্পত্তি ট্রাস্টের মাধ্যমে দান করে গিয়েছেন। অথচ তাঁর নামে উলে- খযোগ্য তেমন কিছুই করা হয় নি। জাতি আশা করে বঙ্গবীর ওসমানীর লিখিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ করা

হবে। আমরা যদি জাতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ওসমানীর আদর্শের বীজবপন করতে পারি তাহলে সার্থক হবে ওসমানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের।

মো. শফিকুর রহমান : ঢাকা দক্ষিণ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক, সিলেট

বঙ্গবীর এম. এ. জি ওসমানীর জীবন ও কর্ম

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

অসীম সাহসী বঙ্গবীর জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর বাড়ি সিলেট জেলার বালাগঞ্জ উপজেলার দয়ামির গ্রামে। তিনি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান বাহাদুর মফিজুর রহমান ও মাতার নাম বেগম জোবেদা খাতুন। ওসমানীর জন্মকালে তাঁর পিতা সুনামগঞ্জের মহকুমা হাকিম (এস.ডি.ও) ছিলেন। তিনি আসাম সিভিল সার্ভিসে চাকুরি করে পরবর্তীকালে ডিরেক্টর অভ ল্যান্ড রেকর্ডস পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

ওসমানীর ডাক নাম আতা। তাঁর পূর্বপুর"ষের কারো নামের সঙ্গে ওসমানী উপাধি ছিল না। কাজেই এটা পারিবারিকসূত্রে প্রাপ্ত কোন উপাধি নয়। জেনারেল ওসমানীর মাতার চাচাতো ভাই-এর বর্ণনা অনুযায়ী ওসমানীর মেট্রিক পরীক্ষার ফরম পূরণ করার সময় তাঁর নামের শেষে দয়ামিরের ওসমান শাহ-এর নামানুকরণে [যিনি হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামের সঙ্গীসাথি ছিলেন না তবে তাঁর প্রতি স্থানীয় লোকদের শ্রদ্ধাবোধ ছিল] ওসমানীর মাতার ইচ্ছানুযায়ী আতার নামের সঙ্গে ওসমানী যোগ করার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করেন। তাঁর মায়ের ধারণা ছিল যে, ওসমানী সাহেবের অসিলায় আতার জীবনে উন্নতি হবে। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলোচনা করে তাঁর সম্মতি পান। যথারীতি মেট্রিক সার্টিফিকেটেও 'মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী' হিসেবে প্রকাশিত হয়।[১]

জেনারেল ওসমানীর হাতেখড়ি ঘটে তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে প্রাইভেট শিক্ষকের মাধ্যমে। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুর" হয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে গৌহাটির কটন স্কুলে। সে সময় সিলেট প্রশাসনিকভাবে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থাৎ স্কুল ও কলেজসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। তিনি সিলেট সরকারি স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের ওই সরকারি স্কুল থেকে ইংরেজি বিষয়ে রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন ও প্রিটোরিয়া পুরস্কার লাভ করেন। তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাস করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিষয়ে এম.এ ক্লাশে ভর্তি হন কিন্তু এম.এ পরীক্ষার পূর্বেই Gentleman Cadet (জেন্টলম্যান ক্যাডেট) হিসেবে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। উলে- খ্য যে, তখন মুসলমান পরিবারের বেশিরভাগ ছাত্রই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতেন।[২]

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি UOTC তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে UOTC-এর সার্জেন্ট নিযুক্ত হন।

তিনি স্যার সৈয়দ আহমদ হলের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দুবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকটরিয়েল সদস্য ছিলেন। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে আসাম-বেঙ্গল ছাত্র সমিতির সহসভাপতি নির্বাচিত হন।

জেনারেল ওসমানী দেরাদুন মিলিটারি একাডেমিতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৩ বছর বয়সে মেজর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কনিষ্ঠ মেজর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে ক'জন সেনা অফিসার কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি আই.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসে নিয়োগ লাভ করেন। কিন্ডু সিভিল সার্ভিসের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। তাই তিনি সেনাবাহিনীর চাকরিই পছন্দ করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের পূর্বে তিনি লে. কর্নেল হিসেবে পদোন্নতির জন্য মনোনীত হন। কিন্ডু ভারত বিভাগের ফলে তাঁর পদোন্নতিতে বিলম্ব ঘটে। তবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর থেকে তাঁর পদোন্নতি কার্যকর হয়। এ-পদে পদোন্নতি লাভ করে তিনি এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন।[৩] ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে পি. এস. সি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তাঁকে পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর পদাতিক বাহিনীতে আত্মীকৃত করা হয় এবং ওই বছরের অক্টোবর মাসে তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্যোগে ওই রেজিমেন্টের মার্চ সংগীত হিসেবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজর"ল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্', সামরিক বাদ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ' এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন্যধান্যে পুষ্পেভরা' গান সরকারিভাবে গৃহীত হয়। তাছাড়া তিনি পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীতে ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্তন করেছিলেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট পাকিস্ড়ান রাইফেলস-এর অতিরিক্ত কমান্ডেন্ট হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করা হয় তাঁর চাকরি পূর্ব পাকিস্ড়ান সরকারের অধীনে ন্যস্ড় করা হয়। তিনি ই.পি.আর-এ অবাঙালি নিয়োগ বন্ধ করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রবর্তন করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তিনি কর্নেল পদে উন্নীত হন। সেনাবাহিনীতে বাঙালি সৈনিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি উলে- খযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে সুযোগ না দেওয়ার জন্য বাঙালি-বিদ্বেষী পাকিস্ড়ানি মহল মিথ্যা প্রচারণা চালাতো যে, বাঙালিরা সামরিক জাতি নয়, তারা সেনাবাহিনীতে চাকরি পাওয়ার যোগ্য

নয়। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, বাঙালিরা শৌর্য-বীর্যে কারো থেকে পেছনে নেই। সাধারণ সৈনিকদের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ এবং বাঙালিদের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

বাংলা ভাষার প্রতি ওসমানীর প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। সে সময় সেনাবাহিনীতে সুবেদার মেজরদের উর্ধ্বতন অফিসারদের নিকট দৈনন্দিন একটি রিপোর্ট দেওয়ার নিয়ম ছিল এবং সে রিপোর্ট লিখতে হতো উর্দুতে। জেনারেল ওসমানী সর্বপ্রথম তাঁর বাঙালি সুবেদার মেজরদের বাংলা ভাষায় দৈনন্দিন রিপোর্ট দেওয়ার নিয়ম চালু করেন। এ-জন্য পাকিস্তানি সামরিকচক্র তাঁর নিকট কৈফিয়ত তলব করে। তিনি এর যথাযোগ্য জবাব দিয়েছিলেন। এসব কারণে তিনি পাকিস্তানি সামরিকচক্রের বিরাগভাজন হন। অনেকের মতে বাঙালি-প্রীতির জন্য তিনি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের কুনজরে পড়েন এবং কর্নেল পদের পর তাঁর আর কোন পদোন্নতি হয় নি।[৪] সে সময় সামরিক শিক্ষা ও কর্মদক্ষতার দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ না থাকা সত্ত্বেও তাঁর পদোন্নতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে কর্নেল হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন।

জেনারেল ওসমানী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং সে বছরের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বালাগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ-গোলাপগঞ্জ ও বিশ্বনাথ নির্বাচনী এলাকা থেকে বিপুল ভোটে সংসদ-সদস্য (এম.এন.এ) হিসেবে নির্বাচিত হন। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক সরকার জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না-করে ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে অপারেশন চার্চ লাইটের মাধ্যমে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু করে। ২৫ মার্চ রাতে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, তিনি ঢাকা ত্যাগ করলে স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা তাঁর নামে নানা কুৎসা রটাবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। তিনি জেনারেল ওসমানীকে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ও জাতির মনোবল অটুট রাখার জন্য আত্মগোপনে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর চোখে ধুলা দেওয়ার জন্য ওসমানী তাঁর গোঁফ কেটে ফেলেছিলেন এবং ২৯ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত ইস্কাটনের একটি ফাঁকা বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন।[৫] ঢাকা ছেড়ে জিঞ্জিরা পৌঁছে তিনি নদীপথে দাউদকান্দি পৌঁছেন এবং সেখানে বাঙালি তরুণরা তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানি মনে করে আটক করে। সেখানে একজন সংসদ-সদস্যের ভাই উপস্থিত দেখতে পেয়ে তিনি তাঁকে তাঁর পরিচয় দেন এবং তিনিই ওসমানীকে নিরাপদ স্থানে

যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকে তিনি পায়ে হেঁটে ও নৌকাযোগে কুমিল- া সীমান্ড়ে পৌঁছে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যুদ্ধরত ব্যাটালিয়নের সঙ্গে মিলিত হন।[৬]

৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে মেজর সফিউল- াহর সদর দফতরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যুদ্ধরত ইউনিটগুলোর কমান্ডারগণ যুদ্ধের কলাকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে এক সভায় মিলিত হন। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানী, লে.কর্নেল আবদুর রব, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সফিউল- াহ, মেজর কাজী নুর"জ্জামান, মেজর নুর"ল ইসলাম, মেজর মমিন চৌধুরী, মেজর শাফায়েত জামিল, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরীসহ অনেকেই। তাঁরা অস্ত্র, গোলাবার"দ প্রভৃতির জন্য অবিলম্বে ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে স্বাধীন সরকার গঠনের প্রয়োজনীতার কথাও তাঁরা উপলব্ধি করেন। ওই সভায় তাঁরা সব বিদ্রোহী ইউনিটের সমন্বয়ে সম্মিলিত মুক্তিফৌজ গঠন করেন এবং কর্নেল ওসমানীকে তা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন।[৭] ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ অর্থাৎ সর্বাধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা দেন। লে. কর্নেল এম.এ.রবকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অভ স্টাফ এবং গ্র"প ক্যাপটেন এ.কে.খন্দকারকে ডেপুটি চিফ অভ স্টাফ নিয়োগ করা হয়। এখানে উলে- খ করা প্রয়োজন যে, মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল নিয়মিত বাহিনী ও গণবাহিনীর সমন্বয়ে।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর সামরিক প্রটোকলের বিষয়টি বিবেচনা না-করায় অনেক সময় অনেক জটিলতা ও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল। এ-ব্যাপারে ওসমানী ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজর"ল ইসলামকে বলেছিলেন যে, তিনি দুঃখিত কারণ তাঁকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।[৮] ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাই তাঁরা মনে করেন যে, একটি কেন্দ্রীভূত একক 'চেইন অভ কমান্ড' থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় সামরিক হাইকমান্ড ওসমানীকে জেনারেল অরোরার সঙ্গে যৌথ সর্বাধিনায়ক হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের মত হলো যে, যৌথ কমান্ডে ওসমানীর স্থান পাওয়া উচিত। পরিশেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে মি. ডি. পি. ধর ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মত করাতে সমর্থ হন এবং যৌথ কমান্ডে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সঙ্গে দ্বৈতভাবে ওসমানীকেও রাখা হয়।

অনেকেই ওসমানীকে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর সমালোচনা করেছেন, তবে একথা সত্য যে, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না এবং তিনি অনেকের সিনিয়র ছিলেন। শিলিগুড়ি সম্মেলনের পর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদর দফতর কলিকাতার থিয়েটার রোডে অবস্থিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারদের এক সভা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় এবং ওই সভায় জিয়াউর রহমান প্রধান সেনাপতি ওসমানীকে দেশরক্ষা মন্ত্রী পদে উন্নীত করে সেক্টর অধিনায়কদের সমন্বয়ে একটি যুদ্ধ কাউন্সিল গঠনের প্রস্ড়াব করেন। আসলে এ-প্রস্ড়াব ছিল তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থার শামিল। ওসমানী এর প্রতিবাদস্বরূপ প্রধান সেনাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন তাঁকে সব সময় সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ওসমানী তা প্রত্যাহার করেন।[৯]

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি যৌথ কমান্ড গঠনের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ-চুক্তিতে ভারত সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী আর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজর"ল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ। বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ করেন যে, ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের পূর্বে যেন ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ না করে। ৮ ডিসেম্বর ভারতের সরকারি মুখপাত্র ঘোষণা দেন যে, পাকিস্ড়ান যদি বাংলাদেশে তাদের পরাজয় স্বীকার করে নেয় তবে ভারত অন্যান্য এলাকায় যুদ্ধ বন্ধ করবে। বাংলাদেশ বা পশ্চিম পাকিস্ড়ানের কোন অংশ দখল করার ইচ্ছে ভারতের নেই।[১০] এ পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল মানেকশ বেতারবার্তার মাধ্যমে জেনারেল নিয়াজীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। ১৩ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্ড়াব তৃতীয়বারের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটোর ফলে বাতিল হয়ে যায়। আমেরিকা ও গণচীনের হস্ড়ক্ষেপ পিছিয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়। তাছাড়া ঢাকার চতুর্দিকে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথবাহিনী ঘিরে ফেলায় হানাদার পাকবাহিনী বেকায়দায় পড়ে যায়। ১৪ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান, ডা. মালিক ও নিয়াজীকে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। নিয়াজীর যুদ্ধ বিরতির প্রস্ড়াবে মানেকশ সম্মত হন এবং পাকিস্ড়ানি হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা থেকে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টা পর্যন্ড় ঢাকার ওপর যৌথবাহিনীর বিমান হামলা বন্ধ রাখা হয়। নিয়াজীর আত্মসমর্পণের সংবাদ পেয়ে সকাল ১০.৪০ মিনিটে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে মেজর জেনারেল নাগরার বাহিনী ঢাকা প্রবেশ করে। বিকেল ৪.০০ টায় ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান ও যৌথবাহিনীর

অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাও বাংলাদেশ বাহিনীর ডেপুটি চিফ লে. জেনারেল ক্যাপটেন এ. কে খন্দকারকে নিয়ে ঢাকা পৌঁছার পর রমনা রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্ড়ানি অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন ও তার রিভলভারটি অরোরার হাতে সমর্পণ করেন। কিন্ড়ু ওই অনুষ্ঠানে ওসমানী উপস্থিত ছিলেন না। তাঁকে এ-বিষয়ে জানানো হয় নি। এতে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। জেনারেল ওসমানী তখন ছিলেন রণাঙ্গন সফরে। তৎকালীন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী জানতেন তিনি কোথায় ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর তিনি লে. জেনারেল স্বাগত সিংহের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন আগরতলায়। তাঁর যাওয়ার কথা ছিল লে. কর্নেল সফিউল- াহর নেতৃত্বে পরিচালিত এস. ফোর্স পরিদর্শনে কিন্ড়ু স্বাগত সিং সেখানে যেতে নিষেধ করেন কারণ এস. ফোর্স তখন অগ্রসর হচ্ছিল। তাই তিনি সিলেট জেড ফোর্স পরিদর্শনে যান। ঘটনাবলি বিশে- ষণ করলে মনে হয় যে, ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ চান নি যে, পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের নিকট আত্মসমর্পণ কর ক, সারেন্ডার দলিলে শুধু জেনারেল অরোরার নাম ছিল।

বাংলাদেশ সরকার এম. এ. জি ওসমানীকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর জেনারেল পদমর্যাদা দান করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁকে এ পদমর্যাদা দিলে অনেক বিভ্রান্ড়ির অবসান ঘটতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনগণ তাঁকে 'বঙ্গবীর' উপাধিতে ভূষিত করে। কিন্ড়ু সরকার তাঁকে কোনো খেতাব প্রদান করে নি। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীতে সি.ইন.সি বা সর্বাধিনায়ক পদ বিলুপ্ত করা হলে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল তিনি নৌ, বিমান ও অভ্যন্ড়রীণ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বালাগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। আবার তিনি মন্ত্রী হন এবং এবার তাঁকে পূর্বের দায়িত্ব ছাড়াও ডাক, তার ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্ড়ু দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি খাপ খাইয়ে চলতে না পারায় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১ মে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

জেনারেল ওসমানী সংসদীয় ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয় এবং এক দলীয় বাকশাল (BAKSHAL) পদ্ধতির

সরকার চালু করা হয়। এর প্রতিবাদে তিনি একযোগে সংসদ ও আওয়ামী লীগ থেকে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি পদত্যাগ করেন।[১১]

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ২৩ আগস্ট ওসমানী মোশতাক সরকারের অবৈতনিক প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার পদগ্রহণ করেন এবং ৩ নভেম্বর পর্যন্ড় এ-দায়িত্ব পালন করেন। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল শাফায়েত জামিল ও অন্যান্য সেনা কর্মকর্তা খন্দকার মোশতাক আহমদকে খুন করতে চেয়েছিল কিন্ড়ু ওসমানী তার জীবন রক্ষা করেন।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে ওসমানী জাতীয় জনতা পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালুর লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সামরিক শাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বির"দ্ধে এবং আবার ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় সিভিলিয়ান কমিটির প্রার্থী হিসেবে বিচারপতি আবদুস সাত্তারের বির"দ্ধে প্রতিযোগিতা করেন কিন্ড়ু উভয় নির্বাচনেই তিনি পরাজয় বরণ করেন।

বাংলাদেশে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও প্রশাসনিক কূটকৌশলের ঝামেলা থেকে বঙ্গবীরও রেহাই পান নি। তিনি পাকিস্ড়ান আমলে গৃহনির্মাণ ঋণসংস্থা থেকে ৩৪,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে সিলেট শহরে নুর মঞ্জিল নামক বাসা তৈরি করেছিলেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের কেবিনেট সভায় (Cabibet Meeting No. CM27/) সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয় যে, যারা স্বাধীনতা পূর্বকালে গৃহঋণ সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছেন তাদের তৎকালীন গৃহীত ঋণ মওকুফ করা হবে। জেনারেল ওসমানীও ঋণ মওকুফের আবেদন জানিয়েছিলেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি তাঁর আবেদন নাকচ করেছিলেন এ-কারণে যে তাঁর ক্ষতিগ্রস্ড় হওয়ার বিষয়টি গৃহীত নীতিমালার আওতায় পড়ে না। ওসমানী সাহেব ঋণ পরিশোধ করতে আরম্ভ করেন এবং ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ড় ৪৫,০,৮১/- টাকা পরিশোধ করেন। ইতঃপূর্বে ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে ৫,৯৩৮.০৭ টাকা ও ১৯৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে ৩,১৬৪.৬৭ টাকা পরিশোধ করা সত্ত্বেও গৃহনির্মাণ ঋণসংস্থা (নম্বর এইচ. বি. ঢাকা ৪,২১৮.৪১ তাং ১৬।৩।৮৩) লিখিতপত্রে তাঁর ১৯৬৯-৭১ পর্যন্ড় পরিশোধকৃত মোট ৯,১০২.৭৪ টাকা হিসাবের মধ্যে গণ্য না করে ১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৮২-৮৩ পর্যন্ড় পরিশোধকৃত

৪৫,০৮১.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে উলে- খ করে কর্পোরেশনের সুদ আসলসহ ১৪,৯৩৪.৭৬ টাকা পাওনা বলে দাবি করেন।

অবশেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে চিঠি দিয়ে (সূত্র নং বিবিধ-১।৮৩।ডি-৯৯।১৭৫ তারিখ ২।৬।৮৩ খ্রি.) জেনারেল ওসমানীকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, গৃহনির্মাণ ঋণসংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে তিনি সিলেট শহরে যে বাসা নির্মাণ করেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দখলদার বাহিনী তা ধ্বংস করার কারণে ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে গৃহনির্মাণ সংস্থার অপরিশোধিত ঋণ আসল সমেত মওকুফ করতে সরকার সম্মত হয়েছে।

বঙ্গবীর ওসমানী একজন পূর্ণ জেনারেল পদে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল অবসরগ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁকে আইনানুগ অবসর ভাতা দেওয়া হয় নি। তিনি পাকিস্ড়ান আমলে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর অবসরগ্রহণ করলেও বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জেনারেলের পদমর্যাদায় উন্নীত সর্বাধিনায়ক হিসেবে পুনরায় চাকরিরত হওয়ার কারণে তিনি বর্ধিত হারে পেনশন পাওয়ার অধিকারী। তদনুযায়ী তিনি প্রতি মাসে পেনশন বাবদ দু'হাজার পঁচাত্তর টাকা পাওয়ার অধিকারী হন এবং সরকার তা মঞ্জুরও করেন। এতদসত্ত্বেও বেআইনিভাবে পরবর্তীকালে তাঁর পাকিস্ড়ান আমলের হারে মাত্র একহাজার একশত টাকা পেনশন নির্ধারণ করা হয়। তিনি এর বির"দ্ধে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর মামলা দায়ের করেন। তৎকালীন সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হয়েছিল যে, তিনি যদি মামলাটি উঠিয়ে নেন তাহলে সরকার তাঁর দাবি অনুযায়ী পুরো পেনশন মঞ্জুর করবে। সেনাবাহিনীর সদর দফতর ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি তারিখের (স্মারক নং ৩৮৩০।এক।পিপি অ্যান্ড এ-২) চিঠি মোতাবেক জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত এম. এ. জি ওসমানীকে কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে জেনারেল পদ থেকে অবসরগ্রহণের পুরো পেনশন মঞ্জুর করা হয় এবং ওই পেনশন আজীবন বলবৎ থাকবে।[১২] ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি অসুখবিসুখে ভোগতে থাকেন। অবশেষে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি চিকিৎসার জন্য লন্ডন যান এবং সেখানে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্র"য়ারি ৬৬ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অন্ড়িম ইচ্ছানুযায়ী সিলেট হজরত শাহজালাল (র.)-এর দরগায় তাঁর মায়ের কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে ওসমানী ছিলেন চিরকুমার। নীতির ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন। তিনি ছিলেন ন্যায় ও সত্যের সৈনিক। মিথ্যার বির"দ্ধে, অন্যায়ের বির"দ্ধে, স্বৈরাচারের বির"দ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। দুর্নীতি,

ধোঁকাবাজি, সম্পদ আহরণ, প্রতারণা এসব কিছুর ঊর্ধ্বে ছিলেন জেনারেল ওসমানী। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী।

তিনি ছিলেন অত্যন্ড় নম্র, ভদ্র, সহজ, সরল ও দয়ালু। তিনি তাঁর সমস্ড় সম্পত্তি গরিব দুঃখী ছাত্র ও জনগণকে সাহায্য করার জন্য তাঁর ও তাঁর মা-বাবার নামে 'দি জোবেদা খাতুন খান বাহাদুর মফিজুর রহমান ট্রাস্ট' গঠন করে দান করে গেছেন।

জেনারেল ওসমানী ধার্মিক ছিলেন কিন্ড়ু তাঁর মধ্যে কোন ধরনের ধর্মান্ধতা ছিল না। তিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি।

জাতীয় জীবনে তিনি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। তিনি অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি যদি তাঁর আত্মজীবনী লিখে যেতেন তাহলে অনেক বিতর্কের অবসান হতো।

তিনি তাঁর জীবন দেশ ও জাতির সেবায় উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, প্রজ্ঞা ও প্রত্যয় অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য।

টীকা :

১. সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, এম.এ.জি ওসমানী প্রসঙ্গে, চিরঞ্জীব ওসমানী, মোহাম্মদ আনোয়ার খান সম্পাদিত, জেনারেল ওসমানী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ, সিলেট, ১ জানুয়ারি ১৯৮৮ খ্রি. পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৫

২. Md. Abdul Aziz, Bongabir Osmani : Portrait of a Leader. in Sylhet : History and Heritage Edited by Sharif Uddin Ahmed, Bangladesh Itihash Samiti, Dhaka, July 1999.

৩. একুশের স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪,

৪. সিদ্দিক সালিক, নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল, নভেম্বর ১৯৮৮

৫. মো. আব্দুল আজিজ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সর্বাধিনায়ক ওসমানী, সময়, ঢাকা, এপ্রিল ২০০০।

৬. হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, অবরুদ্ধ সংবাদপত্র '৭১ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল, ঢাকা ১৯৮৩

৭. মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১, ইউ.পি.এল. ঢাকা ১৯৮৬

৮. মো. আব্দুল আজিজ, –পূর্বোক্ত

৯. মো. আব্দুল আজিজ, –পূর্বোক্ত

১০. মঈদুল হাসান, –পূর্বোক্ত

১১. মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান (সম্পাদিত), অনির্বাণ ওসমানী, সিলেট, ১৯৮৬

১২. বিজন কুমার দাস, 'জেনারেলের প্রাপ্য পেনশন দাবিতে বঙ্গবীর ওসমানীর মামলা : প্রাসঙ্গিক তথ্য ও স্মৃতিচারণ', চিরঞ্জীব ওসমানী, জেনারেল ওসমানী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ, সিলেট, ১ জানুয়ারি, ১৯৮৮ খ্রি.

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (১৯৪২-২০০৬) : সাবেক ভিসি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

বঙ্গবীর এম.এ.জি ওসমানী

রফিকুর রহমান লজু

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নন্দিত প্রধান সেনাপতি মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী এক বিরল প্রতিভাবান সেনা অফিসার ছিলেন। শুধু বাঙালি হওয়ার কারণে পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীতে তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন হয় নি। এই একটি মাত্র কারণে চাকরিজীবনে তিনি ন্যায্য সমাদর ও স্বীকৃতি থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। ওসমানী যদি বাঙালি না-হয়ে পাঞ্জাবি বা পশ্চিম পাকিস্ড়ানি হতেন তা হলে তাঁর সৈনিকজীবন অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা পেতো। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি-বিদ্বেষী পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর শ্যেনদৃষ্টির কড়া নজরদারির মধ্য থেকেও সুযোগ-সুবিধা মতো তিনি বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে তৎপর ছিলেন। তাঁর বাঙালিত্বের গর্ব ও অহংকার গোপনীয় কিছু ছিলো না। বাঙালি-প্রীতির কারণেই পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীতে তাঁর অত্যন্ড় সম্ভাবনাময়ী চাকরির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধূলিস্মাৎ হয়েছিলো। এজন্য তাঁর মনে কোনও খেদ বা অনুতাপ ছিলো না। বস্ড়ুত পাকিস্ড়ানি শাসনামলে রাষ্ট্রীয়ভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্ড়ান কিংবা বাঙালিদের প্রতি যে সীমাহীন বঞ্চনা, অন্যায়-অবিচার চলছিলো সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিজাতীয় ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিলো তাঁর মাঝে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় যাঁদের অবদান প্রাতঃস্মরণীয় তাঁদের সঙ্গে এম.এ.জি ওসমানীর নামও ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি যে সাহস, নৈপুণ্য ও নিরলস নিষ্ঠা সর্বোপরি বিজয় লাভে যে দৃঢ় নিশ্চয়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তার জন্য বাংলাদেশের মানুষ শুধু কৃতজ্ঞই নয়, বাঙালি জনগণ তাঁর কাছে চিরঋণীও। বাংলাদেশের নাম উচ্চারণ করলে যাঁর নামটি অনিবার্যভাবে সামনে আসে তিনি আর কেউ নন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর আর যাঁদের নাম উলে- খ্য, তাঁদের সঙ্গে বঙ্গবীর ওসমানীর নামও উচ্চারিত হয়। বাংলার জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে ভাবাবেগ ও উচ্ছলতায় তাঁকে বঙ্গবীর অভিধায় ভূষিত করেছিলো—সেটা অত্যন্ড় সুবিবেচনাপ্রসূত ছিলো তাতে সন্দেহ নেই। জেনারেল ওসমানী বাঙালি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁর অহংকার ছিলো, গর্ব ছিলো। মুক্তিযুদ্ধে সাফল্য ও কৃতিত্বের যে গৌরব সেখানে তিনি নিজেকে বড় করে দেখেন নি। তিনি মনে করেন এই বিজয় গৌরব ও অহংকারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হলেন ত্রিশ লক্ষ বীর বাঙালি—যাঁরা বিজয় ছিনিয়ে আনতে শহিদের

ভাগ্য বরণ করেছেন, আর যাঁরা নানাভাবে নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছেন তাঁরা-ই।

জেনারেল ওসমানীর জন্ম তৎকালীন বৃহত্তর সিলেট জেলার উলে- খযোগ্য মহকুমা সুনামগঞ্জ শহরে হলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্তমান সিলেট জেলাধীন বালাগঞ্জ উপজেলার দয়ামির গ্রামে। ওসমানীর জন্মকালে তাঁর পিতা খান বাহাদুর মফিজুর রহমান ছিলেন সুনামগঞ্জের মহকুমা হাকিম। তর"ণ বয়সে আতাউল গণি নামের শেষে 'ওসমানী' যুক্ত ছিলো না। পরে মায়ের একান্ড় ইচ্ছায় এক দরবেশ ব্যক্তির নামের অংশ 'ওসমানী' তাঁর নামের শেষে যুক্ত হয়। 'ওসমানী' তাঁদের পারিবারিক পদবি নয়। তবু ওসমানী নামেই তিনি অতি পরিচিত ছিলেন। ওসমানীর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় নিজগৃহে মায়ের তত্ত্বাবধানে এক গৃহশিক্ষকের নিকট। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুর" হয় আসামের গৌহাটি কটন স্কুলে। পরে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট সরকারি হাইস্কুল থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স (মেট্রিকুলেশন) পরীক্ষা পাস করেন এবং ইংরেজি বিষয়ে বেশি নম্বর পেয়ে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য প্রিটোরিয়া পুরস্কার লাভ করেন। অতঃপর তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। পরে"াতকোত্তর ক্লাসে ভর্তি হলেও অধ্যয়ন অসমাপ্ত রেখে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে জেন্টলম্যান ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন। জেনারেল ওসমানীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ কালে ক্লাসের বাইরে বিভিন্ন কর্মকা"ে অংশ নিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। এ-থেকে তিনি পরবর্তীকালে সেনাজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। ওসমানী ভারতের দেরাদুন সামরিক একাডেমিতে সামরিক শিক্ষাগ্রহণ শেষে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে রাজকীয় কমিশন লাভ করেন। নিজের দক্ষতা ও মেধার গুণে তিনি মাত্র দু বছর সময়ের মধ্যে মেজর পদে উন্নীত হন এবং একটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এসময় তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর এবং তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কনিষ্ঠ মেজর। ওসমানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা রণাঙ্গনে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বার্মা রণাঙ্গনে হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন অশ্বেতাঙ্গ সেনা কর্মকর্তা অধিনায়ক হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বাঙালি মেজর ওসমানী তাঁদের অন্যতম ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা পরিসমাপ্তির পর তিনি আই.সি.এস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সার্ভিসের জন্য মনোনীত হন। সামরিক জীবনের প্রতি ওসমানীর একটা আলাদা আকর্ষণ ছিলো। তিনি তাই পলিটিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিতে

অনীহা প্রকাশ করেন। একইভাবে ওসমানী কূটনৈতিক বিভাগে যোগদানের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন। পরে তিনি যখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে পদোন্নতির জন্য মনোনীত হন তখন ভারত বিভাগ পরিকল্পনা চূড়ান্ড় হওয়ায় তাঁর পদোন্নতি কার্যকর হয় পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। পাকিস্ড়ান সৃষ্টির পরের বছরই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আতাউল গণি ওসমানী পাকিস্ড়ানের কোয়েটা স্টাফ কলেজ থেকে পি.এস.সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর চিফ অভ দি জেনারেল স্টাফ, মেজর জেনারেল হাটন-এর জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড-১ নিযুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের নিয়ে আলাদা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও ন্যায্যতা অনুভূত হলেও পাকিস্ড়ানের সামরিক উচ্চপদস্থ অফিসার এবং সরকারের বড় কর্মকর্তারা তা চাইতো না। দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীর উচ্চপদে বাঙালিদের নিয়োগ এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনের সম্ভাব্যতা ঠেকিয়ে রেখেছিলো তারা। বাঙালি-বিদ্বেষী শক্তির বির"দ্ধে ওসমানী অন্য বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে কৌশলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্ড়ান সরকার প্রথম থেকেই বাঙালি অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্ড়ানবাসীর সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ শুর" করেছিল। ন্যায্য অধিকার ও পাওনা থেকে বাঙালিদের ছলেবলেকৌশলে দূরে সরিয়ে রাখে এবং পবিত্র ইসলামধর্মকে ব্যবহার করে বাঙালিদের ওপর একচেটিয়া শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখে। প্রাপ্য সকল অধিকার থেকে বাঙালিদের বঞ্চিত রাখে। তেমনই পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীতেও বাঙালিদের দাবিয়ে রাখা হয়, সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। শিক্ষা, মেধা ও যোগ্যতায় সামনের কাতারে থেকেও উচ্চ গুর"ত্বপূর্ণ পদে বাঙালিরা নিয়োগ পেতো না। ওসমানী বঞ্চিত ও নিগৃহীত বাঙালি সেনাদেরকে কাছ থেকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন। সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার ও উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি বিভিন্ন সময়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। ওসমানীর এই সাহসী ভূমিকার কথা পাকিস্ড়ানের শীর্ষ সেনাকর্মকর্তাদের অজানা ছিলো না। এজন্য সরাসরি তাঁর বির"দ্ধে কোনো ব্যবস্থা না-নিলেও তাঁর এই ভূমিকার জন্য পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীতে ওসমানী গুর"ত্বপূর্ণ কোনো পদোন্নতি পান নি। তা সত্ত্বেও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে এবং শক্তিশালীরূপে গড়ে তুলতে ওসমানী নিরলসভাবে কাজ করেছেন। আমরা অনেকেই অবগত নই যে, বেঙ্গল রেজিমেন্টের মার্চ-সংগীতরূপে যে-গানটি আমাদের হৃদয়-মনকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে এবং সামরিক বাদ্যযন্ত্রে যে দুটি গানের সুর ঝংকৃত হয়ে আমাদের উদ্বেলিত করে তা বাংলাভাষার তিন দিকপাল কবির রচিত গান। মার্চ সংগীতটি কবি কাজী

নজর“ল ইসলামের ‘চল চল চল ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল....’ এবং বাদ্যযন্ত্রে সুর তোলা গান দুটি হলো কবি রবীন্দ্রনাথের ‘গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ...’ ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...’। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে এই গানগুলো সরকারিভাবে চালু করা সম্ভব হয়েছে কর্নেল ওসমানীর উদ্যোগ ও দৃঢ়তার কারণে। একইভাবে তিনি বাঙালি লোক-ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ব্রতচারী নৃত্যেরও প্রবর্তন করেছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টে।

জেনারেল ওসমানীর সাহসী ও যুগান্ড়কারী পদক্ষেপ হলো ইস্ট পাকিস্ড়ান রেজিমেন্টে (ই.পি.আর) অবাঙালিদের নিয়োগ বন্ধকরণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের নিয়োগ-প্রথার সূচনা করা। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় যখন ই.পি.আর-এর অতিরিক্ত কমান্ডেন্ট হিসেবে তাঁর চাকরি পূর্ব বাংলা সরকারের অধীনে ন্যস্ড় করা হয় তখন তিনি ওই দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ই.পি.আর-এ তাঁর নিয়োগ ছিলো অস্থায়ী এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তিনি কর্নেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এ সময় তাঁকে সেনাবাহিনী সদর দফতরে মিলিটারি অপারেশনের ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পাক ভারত যুদ্ধের ফলাফল, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা থেকে পূর্ব পাকিস্ড়ানবাসীর চোখ খুলে গিয়েছিলো। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্ড়ানবাসীর অসহায় অবস্থার কর“ণ চিত্র ফুটে ওঠে। এই সময় পূর্ব পাকিস্ড়ানের দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্রসমাজ ও জনগণের সচেতন-অংশ পূর্ব পাকিস্ড়ানের অসহায় অবস্থা অবলোকন করেছেন, উপলব্ধি করেছেন যে, আসলেই পূর্ব পাকিস্ড়ান অরক্ষিত। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ওসমানী পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনীর সামরিক অপারেশনের ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে আসীন ছিলেন। তিনি ভালো করেই জানতেন কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী দেশের বাঙালি অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলকে ফুটো করে রেখেছে কিন্ড়ু যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় হাড়ে হাড়ে তারা টের পেলেন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক তথা সবদিক দিয়েই পূর্ব পাকিস্ড়ানকে নিঃস্ব-রিক্ত করে রেখেছে। ওসমানী যুদ্ধ চলাকালীন তাঁর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুর্বলতা কাটাতে সচেষ্ট ছিলেন এবং যুদ্ধকালীন ও পরবর্তী সময়েও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুনাম ও দক্ষতা ধরে রাখতে অত্যন্ড় পরিশ্রম করেন।

ওসমানী পাকিস্ড়ানে তাঁর চাকরিজীবনের গোটা সময়ই সরকার ও সামরিক কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা থেকেছেন। তা সত্ত্বেও দীর্ঘ দুই দশক যোগ্যতার সঙ্গে সকল দায়িত্ব পালন করে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্র“য়ারি কর্নেল হিসেবে তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

পাকিস্ড়ান সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিলেও তাঁর সৈনিকজীবনের যে অবসান হয় নি এ-কথাটা স্বয়ং ওসমানীরও বোধহয় জানা ছিলো না। ওসমানী যে সময়

অবসরগ্রহণ করেন তখন পূর্ব পাকিস্ড়ানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিলো উত্তপ্ত। বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন তখন খুবই তুঙ্গে। জাতীয়তাবাদী চেতনায় বাঙালিরা দ্র ত জেগে উঠছে। সচেতন নাগরিক হিসেবে ওসমানী তা লক্ষ করলেও রাজনীতির প্রতি তখনই তাঁর কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নি। তবে মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন বাঙালি, আর তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুলিঙ্গ তাঁর অন্ড়রকে উত্তপ্ত করে চলেছিলো। তখন বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালি মানসে নতুন আশা ও জাগরণের সঞ্চার করেছে। বাঙালি চেতনায় উজ্জীবিত কর্নেল ওসমানী আর কালক্ষেপণ না-করে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগে যোগদান করেন ১৯৭০-এর জুলাই এবং ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিজ নির্বাচনী এলাকা (সিলেটের বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও বিশ্বনাথ থানা) থেকে নির্বাচন করেন। এটা ছিলো সারা পাকিস্ড়ানের বৃহত্তর নির্বাচনী এলাকা। ওসমানী চারজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জাতীয় পরিষদের সদস্য (এম.এন.এ) নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সরকার গঠনের জন্য প্রস্ড়ুত হয়। কিন্ড়ু ভুট্টো-ইয়াহিয়া চক্র বাঙালিদের বিজয় অস্বীকার করে, বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়র না-করে বাঙালি নিধনে মেতে ওঠে। ২৫ মার্চ, '৭১ রাতে সশস্ত্র পাকিস্ড়ানি সৈন্যরা নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালি-হত্যায় মেতে ওঠে। সাহসে ভর করে বীর বাঙালি ফুঁসে ওঠে, র খে দাঁড়ায় জল- াদ বাহিনীর বর্বরতা। শুর হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ।

যে সেনাবাহিনীর অধীনে ওসমানী তাঁর সৈনিকজীবন কাটিয়েছেন সেই সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর এখন স্বজাতির হয়ে একই বাহিনীরই বির দ্ধে লড়বার জন্য তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের যুদ্ধরত বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সম্মিলিত মুক্তিফৌজ। তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করে নেয় কর্নেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীকে। ওসমানী তাঁর সমর কুশলতা, মেধা, অভিজ্ঞতা সমস্ড় উজাড় করে নিবেদন করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের জন্য। ওসমানী ছিলেন অত্যন্ড় কর্মোদ্যোগী ও কর্মপরায়ণ, বয়সের ভার তাঁকে এতটুকু কবজা করতে পারে নি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিরলস ঘুরে বেড়িয়েছেন রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে, দেশের এক প্রান্ড় থেকে অপর প্রান্ড়ে। ওসমানীর সৈনিকজীবন গড়ে ওঠেছিলো সুনিপুণ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অধীনে। বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ব্রিটিশ ও পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীতে কাজ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একজন অধিনায়ক হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনার কৃতিত্বও রয়েছে তাঁর। সব মিলিয়ে

ওসমানী যেমন সমরবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ও নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে ওয়াকেবহাল ছিলেন, তেমনই সমরকুশলী হিসেবেও সুনামের অধিকারী ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সীমাহীন সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, প্রতিকূল অবস্থা, সর্বোপরি যুদ্ধ-সাজসরঞ্জামের অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রধান সেনাপতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সময়ে সময়ে উদ্ভাবিত নতুন নতুন কৌশল আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সফল পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়েছিলো।

অবশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের সীমাহীন ত্যাগ, প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরবিক্রম লড়াই, সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতায় নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের সফল পরিণতির মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর দুর্ধর্ষ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরাজয় স্বীকার করে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ভুট্টো-টিক্কা-ইয়াহিয়া-নিয়াজীর দম্ভ, লম্ফঝম্প ও হুংকার নিমিষে স্তব্ধ হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় গৌরবের নায়ক মুক্তিযোদ্ধা ও দেশবাসীর মনে আত্মসমর্পণ লগ্নের একটি ঘটনার খেদ আজও কষ্টের উদ্রেক করে। ভাবতে অবাক লাগে পরাজিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় গৌরবের অধিকারী মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন না। কী কারণে এমনটি ঘটলো এবং বাংলাদেশ সরকার ওসমানীকে বাদ দিয়ে তড়িঘড়ি করে কেন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান আয়োজনে রাজি হলো এখনো তা অজানা রয়ে গেছে। এখানে আরেকটি ঘটনা প্রশ্নবোধক হয়ে আছে এবং বিষয়টিকে আরও ঘোরতর করে তুলেছে। একই দিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর যেদিন হানাদার শত্রুবাহিনীর ৯৩ হাজার শত্রুসেনা আত্মসমর্পণ করেছিলো সেই দিন বিকেলে ভারতের আগরতলা থেকে বাংলাদেশের জেলাশহর সিলেট যাওয়ার পথে ওসমানীকে বহনকারী হেলিকপটারটি পথিমধ্যে গুলিবিদ্ধ হয় এবং দৈববলে সঙ্গীসাথিসহ তিনি প্রাণে বেঁচে যান। এ-প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সময় কর্নেল ওসমানী সম্পর্কে অন্য একটি বিষয় উলে- খের দাবি রাখে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার (অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার) কর্নেল ওসমানীকে সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতিরূপে মনোনীত করেছিলো কিন্তু সময়ের দাবি ও প্রয়োজন অনুসারে সরকার তাঁর সামরিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। এজন্য ভারতীয় সামরিক অফিসারগণ স্বভাবত তাঁকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখতেন। অসম পদমর্যাদার কারণে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর উচ্চতর অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সামরিক প্রটোকল অনুযায়ী ওসমানীকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হতো।

এতদসত্ত্বেও ওসমানী অত্যন্ড় সচেতনভাবে মুক্তিযুদ্ধের দ্র“ত সফলতার লক্ষ্যে একাগ্রচিত্তে নিয়োজিত ছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ সরকার কর্নেল ওসমানীকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দান করে এবং তা কার্যকর হয় ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে। একই সময় বাংলার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে 'বঙ্গবীর' উপাধিতে ভূষিত করে। সরকার ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল প্রধান সেনাপতির পদ বিলুপ্ত করলে জেনারেল ওসমানী আরেকবার সামরিক বাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি বাংলাদেশ সরকারের জাহাজ চলাচল, অভ্যন্ড়রীণ নৌ ও বিমান চলাচল মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরের বছর (৭মার্চ, ১৯৭৩) বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি আবার সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। পুনরায় তাঁকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগে যোগদানের পূর্বে ওসমানী কোনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি রাজনীতিমনস্কও ছিলেন না। রাজনীতির মারপ্যাঁচ তিনি জানতেন না। তবে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্ভেজাল অনুসারী। তাই ১৯৭৫-এ সরকারের সংবিধান সংশোধনী বিল বা বাকশাল গঠনকেও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি সংসদ-সদস্যপদ এবং আওয়ামী লীগ থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন।

অতঃপর বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনকালো অন্ধকার বাসা বাঁধে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সেনাসদস্য রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয়। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ দেশবাসীকে হতবাক করে রাষ্ট্রপতির আসনে আসীন হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার গৃহীত সকল প্রগতিশীল ও উন্নয়ন কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়ে। অমাবস্যার অন্ধকারে গ্রাস করে বাংলাদেশকে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের বিপরীত স্রোতে দেশকে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ড় শুর“ হয়। এই পর্যায়ে জেনারেল ওসমানীর ভূমিকা নিয়ে কিছুটা বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর খন্দকার মোশতাকের অবৈতনিক প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার পদ গ্রহণ এবং খন্দকার মোশতাককে বিক্ষুব্ধ সেনাকর্মকর্তাদের হাত থেকে রক্ষা করাসহ দু-একটি প্রশ্নে তাঁর সবিরোধিতা লক্ষ করা যায়। এ-প্রসঙ্গে মো. আব্দুল আজিজের 'বঙ্গবীর ওসমানী একজন জননেতার জীবনালেখ্য' থেকে লেখকের মন্ড়ব্যটি উলে- খ করা যায়: 'ওসমানীর এ-ধরনের আচরণের একটি ব্যাখ্যাই হয়তো রয়েছে এবং তা হলো যে কোনো পরিস্থিতিতে দেশকে অধিক রক্তপাতের হাত থেকে রক্ষা করা। পঁচাত্তরের নভেম্বরের অশান্ড় দিন সম্পর্কে এন্থনি

ম্যাসকারেনহাসের নিকট উক্তিতে ওসমানীর সে উদ্বেগই ধরা পড়েছে। সেদিনের ঘটনা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, I kept telling myself, my god, this is going to be another bloody massacre. (সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সম্পাদক শরীফউদ্দিন আহমেদ। প্রকাশক-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি। প্রথম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৬৮১)।'

বাকশাল গঠনকে কেন্দ্র করে জেনারেল ওসমানী ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোনো দলে যোগদান করেন নি। তবে সৈনিকজীবন শেষে রাজনীতির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পর তিনি আর রাজনীতিবিমুখ হন নি। পরবর্তী জীবনে রাজনীতির সঙ্গেই বসবাস করেছেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ওসমানী নিজেই একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। নাম দিয়েছিলেন জাতীয় জনতা পার্টি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর দল কোনো প্রভাব ফেলতে বা অবদান রাখতে পারে নি। তিনি দুইবার রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন করেছেন। প্রথম বার সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামরিক শাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বির"দ্ধে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসেবে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে অংশ নেন। দ্বিতীয় বার ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে নাগরিক কমিটির প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন বিচারপতি সাত্তারের বির"দ্ধে। দু'নির্বাচনেই তিনি খালি হাতে ঘরে ফিরেছেন।

আমরা জেনারেল ওসমানীকে যে-ভাবেই দেখি না কেন, যে-ভাবেই বিচার করি না কেন তিনি ছিলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্ড়ানদের অন্যতম। ইতিহাসে তাঁর স্থান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতিরূপে। ওসমানী জাতির গর্ব, দেশের সম্পদ। জেনারেল ওসমানী অকৃতদার ছিলেন এবং তাঁর সমুদয় সম্পত্তি 'দি জোবেদা খাতুন খান বাহাদুর মফিজুর রহমান ট্রাস্ট'-এর নামে দান করে গেছেন তিনি। ওসমানীর ইচ্ছে অনুযায়ী এই ট্রাস্টের আয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও জনহিতকর কাজে ব্যয় হচ্ছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নন্দিত প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী আমাদের এই সুন্দর ভুবনে ৬৬ বছরের জীবন উপভোগ করেন। তাঁর জন্ম সুনামগঞ্জ শহরে, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর। মৃত্যু : ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্র"য়ারি লন্ডনের একটি হাসপাতালে।

রফিকুর রহমান লজু (২২ মার্চ, ১৯৪৫): শিক্ষক, লেখক-কলামিস্ট ও সংস্কৃতিসেবী

জেনারেল ওসমানীর মৃত্যু পরবর্তী জাতীয় সংবাদপত্রের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (সম্পাদকীয় নিবন্ধ)

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জাতীয় বীর জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী ১৯৮৪-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। দুঃসংবাদটি সারা দেশে ওই দিনই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সবখানে নেমে আসে শোকের ছায়া। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের ইন্তেকালে ১৮ ফেব্রুয়ারি শনিবারের (৫ ফাল্গুন ১৩৯০ বাংলা) জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধ। মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এসব নিবন্ধে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করা হয়।

জেনারেল ওসমানীর চরিত্র এদেশের মানুষের চোখে একটি বিরল চমকপ্রদ আদর্শ। অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনায় গণমানসে প্রতিষ্ঠিত ওসমানীর মূল্যায়নে দৈনিক ইত্তেফাকের ভাষ্য :

> গল্প-উপন্যাসে একরকম আশাবাদী চরিত্রের বর্ণনা থাকে, বাস্তবে যাহা পাওয়া কঠিন। জেনারেল ওসমানীর দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, নীতি ও আইনের শাসনের প্রতি আনুগত্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, চারিত্রিক তেজস্বিতা—এমনকি কিছু কিছু ভাবালু আচরণও কতক ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক মিলিয়া যায় গল্প-উপন্যাসের সেইসব আদর্শবাদী চরিত্রের সঙ্গে। আদর্শের প্রতি এমন অচল-অটল মানুষ দুনিয়ার কোন সমাজেই খুব বেশি থাকে না। সেইদিক দিয়া জেনারেল ওসমানী এক বিরল-দর্শন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। 'শির দেগা নাহি দেগা আমামা'—এই বাক্যটি যেন এই খর্বকায় আর অমিততেজ সাহসী পুরুষের ইমেজকে সামনে রাখিয়াই লেখা হইয়াছিল। আপস বলিতে কোন কথা তাঁহার পারিবারিক বা রাজনৈতিক জীবনে প্রায় ছিল না বলিলে খুব একটা অত্যুক্তি হয় না। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাকশাল গঠনের সময় আওয়ামী লীগ ত্যাগের পিছনেও একই মনোভাব। একই সাহস ও তেজ। পরবর্তী সময়ে জাতির বিভিন্ন সঙ্কটময় মুহূর্তে জেনারেল ওসমানী বহুবারই বিরোধী ভূমিকা তখনকার মত বিস্মৃত হইয়া প্রতিষ্ঠিত সরকারের সাহায্য-সহযোগিতায় আগাইয়া আসিয়াছেন। এখানেও সেই দেশপ্রেমের আদর্শ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন। কেহ কেহ সময়ে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন। কিন্তু কে কি ভাবিল তাহা লইয়া জেনারেল ওসমানীর দুর্ভাবনা কোনদিনই ছিল না। আদর্শ ও ন্যায়-নীতির দাবিই তাঁহার কাছে সদা-সর্বদা বড় ছিল, সেই দাবি পূরণই ছিল তাঁহার জীবনের একাগ্র সাধনা।

রাজনীতির মাঠে ওসমানী ছিলেন সংযমী, স্পষ্টভাষী এবং অকপট। আবেগ নির্ভর সস্ড়া রাজনীতির পথ ধরে সাময়িক চমৎকারিত্ব প্রদর্শনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। গণমানুষের বুদ্ধিবৃত্তির কাছেই ছিল তাঁর আবেদন। দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ-দিকটি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে এভাবে :

> রাজনীতির ক্ষেত্রে, স্বীয় মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে জেনারেল ওসমানী ছিলেন যেমন অকুণ্ঠ তেমনি অকপট। রাজনৈতিক কপটতাকে তিনি কখনো কলাকৌশলের ছদ্মবেশ পরিয়ে লালন করেন নি। পরবর্তী সময়ে এই রাজনৈতিক সততাই তাকে স্বীয় আদর্শ ও চিন্ড়াধারাকে রূপ দিতে চালিত করেছিল জাতীয় জনতা পার্টি গঠনে।
>
> রাজনীতি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের সংক্ষিপ্ত কোন পথে কখনও তিনি পদচারণা করেন নি কিংবা ক্ষমতার লোভে আপস মনোবৃত্তির পরিচয় দেন নি। এই মানসিকতাই রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁকে এক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে। এদেশের রাজনীতিতে খেয়ালি আবহাওয়ার ঊর্ধ্বে সভা-সমিতির মত্ততায় নিজেকে সমর্পিত না করে ধীর শান্ড়চিত্ত অনুচ্চভাষী এই জেনারেল বাকচাতুর্যে শ্রোতৃমন্ডলীর চিত্তে তড়িৎ সঞ্চারের পরিবর্তে যুক্তির প্রতি আনুগত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। পেশাদার রাজনীতি ক্ষেত্রের সাফল্য তাই কখনো তাকে বরণ করে নি।

গণকল্যাণই ছিল ওসমানীর রাজনীতির একমাত্র এবং নির্ভেজাল লক্ষ্য। আজীবন এ লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অবিচল। দেশ ও জাতির কল্যাণে প্রত্যাশিত এবং সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করে ওসমানী তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেমের প্রমাণ রেখেছেন বার বার। এদিকটির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে দৈনিক বাংলার মন্ড়ব্য :

> স্বাধীনচেতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটি দেশ ও জাতির সঙ্কটের মুহূর্তে তাঁর কর্তব্য ও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে কখনো কার্পণ্য করেন নি। তিনি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং দেশ ও জনগণের কল্যাণের দিকটাকেই বড় করে দেখেছেন। সরকারি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং মন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত থাকাকালে যেমন, অন্য সময়েও তেমনি। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট এবং নভেম্বরের সঙ্কটকালে তাঁর দৃঢ় ভূমিকা জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গণতন্ত্রমনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ জেনারেল ওসমানী ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ সংশোধনী ও একদলীয় ব্যবস্থা 'বাকশাল' চালুর প্রতিবাদে সংসদ-সদস্য পদে ইস্ড়ফা দিয়ে এবং তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে আরেক দৃষ্টান্ড় স্থাপন করেন। বস্ড়ুত, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং মূল্যবোধই তাঁকে সাহসিক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ওসমানীর রাজনৈতিক জীবন কালের হিসাবে সুদীর্ঘ নয়। কিন্তু সময়ের গুরুত্ব এবং চারিত্রিক মহিমায় তিনি সময়ের গণ্ডি অতিক্রম করে অনায়াসে সৃষ্টি করেছেন কালজয়ীর আবেদন। দৈনিক সংগ্রামের ভাষায় :

> এ দেশবাসীর কাছে তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের সময়কাল দীর্ঘদিনের না হলেও তিনি জাতীয় যেসব দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে এসে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন, দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনৈতিক নেতৃত্বদানকারী অনেকের চাইতেও সময়ের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে তাঁর নেতৃত্ব আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে জাতির কাছে প্রতিভাত হয়েছে। ... দুঃখের সাথেই স্বীকার করতে হয়, আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি নিষ্ঠার বড়ই অভাব। জেনারেল ওসমানী এই সাধারণ কাতারে পড়েন না। তাঁর নীতির সাথে অনেকের দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু সবাই স্বীকার করবেন, তিনি নীতি হিসাবে যা গ্রহণ করেছিলেন, সেখান থেকে কোনো লোভ বা ভয় কোনো কিছুতেই একবিন্দু পিছু হটেন নি।

নিখাদ দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত ওসমানী ছিলেন নির্ভীক এবং স্পষ্টভাষী। সর্বাবস্থায় দেশের স্বার্থই ছিল তাঁর কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। দেশের স্বার্থ ব্যাহত হচ্ছে দেখেও লাভ-লোভ অথবা ভয়ে কেউ হয়তো নীরব থাকতে পারে। কিন্তু ওসমানী? দৈনিক দেশের সম্পাদকীয় মন্তব্য :

> স্বদেশগত প্রাণ একজন পরীক্ষিত জাতীয়তাবাদী ছিলেন জনাব ওসমানী। জাতীয় আত্মশ- াঘাবোধ ছিল তাঁর চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই হীনমন্যতা কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর ভারতীয় বাহিনী যখন বাংলাদেশ থেকে বহুশত কোটি টাকার অস্ত্র নিয়ে যায়, মাওলানা ভাসানীর সাথে একাত্ম হয়ে তীব্র ভাষায় তিনি তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ওসমানী তাঁর দক্ষতা সততা এবং গুণপনা দিয়ে সবার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা অর্জন করেছেন। সেই ব্রিটিশ যুগে শুরু হয়েছিল তাঁর সৈনিকজীবন। কার্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে ঘটেছে তাঁর সৈনিকজীবনের সফল পরিসমাপ্তি। দি বাংলাদেশ ওবজারভারের ভাষায় :

> His was an active and efficient military career that began with his commission in the then British Indian Army and continued till before the time he assumed a dedicated role as Commander-in Chief of Bangladesh Army in 1971. His sense of discipline and patriotism earned him the respect and love of his compatriots in all the fields in which he found himself working since.

আদর্শ দেশপ্রেমিক ওসমানীর ইন্তেকালে উলি- খিত সংবাদপত্র ছাড়াও *দৈনিক বাংলার বাণী*, *দি নিউ নেশন*সহ অন্যান্য পত্রপত্রিকাও দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। আঞ্চলিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনসমূহ মরহুমের জীবন ও অবদান নিয়ে প্রকাশ করে বিস্ড়ারিত প্রতিবেদন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কিংবদন্তিড়র এই মহানায়ক এভাবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে জয় করে গেছেন।

সূত্র : নাম তাঁর ইতিহাস

গ্রন্থনা : **আবদুল হামিদ মানিক**

আবুল লেইছ শ্যামল

আমার ক্যামেরায় ওসমানী ও কিছু কথা

জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক ছিলো দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতার আগে এবং পরে তাঁর স্নেহ-ধন্যে আমি ছিলাম আপ- ুত। সিলেট তিনি এলেই আমি ফ্রি-ল্যান্স ফটো সাংবাদিক হিসেবে তাঁর সান্নিধ্য-সংস্পর্শ পেতে ছুটে যেতাম। তিনি ছিলেন খুবই সময় সচেতন শৃঙ্খলাপরায়ণ। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের কথা। তিনি তখন মন্ত্রী। সিলেট সফর শেষে দু-টার দিকে বিমানে করে ঢাকা যাবেন। দেড়টা বাজতেই সিলেট বিমানবন্দরে উপস্থিত হন এবং কর্তব্যরত সরকারি কর্মকর্তারা যাতে বিব্রতবোধ না-করেন এ-জন্য তিনি বাইরে আমাদের সঙ্গে জমিয়ে তুলেন আড্ডা। এরপর ঠিক ঘড়ির কাঁটা দেখে দশ মিনিট আগে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানবন্দরের কাস্টমস র ুমে প্রবেশ করেন। এই ছিল তাঁর সময়-জ্ঞান।

একই সময়ের আরও একটি ঘটনা মনে পড়ছে—সারাদেশ বন্যাকবলিত। জেনারেল ওসমানী ত্রাণ বিতরণের জন্য সিলেট এলেন। তাঁর সঙ্গে *সমাচার* সম্পাদক আবদুল ওয়াহিদ খান, সাবেক সাংসদ নুর ল ইসলাম অ্যাডভোকেটসহ আমরা কয়েকজন ছাতক হয়ে কোম্পানিগঞ্জে বন্যার্তদের খোঁজখবর নিতে যাই। ফিরতি পথে, সাংসদ, রাজনীতিবিদ দেওয়ান ফরিদ গাজীসহ বহু নেতাকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়। গাজী সাহেবও বন্যার্তদের নিয়ে চিন্ড়াগ্রস্ড়। সঙ্গীসাথিসহ তিনি ছুটছেন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে। সবার উদ্দেশে ওসমানী সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করলেন। বললেন, বেশভূষায় চাকচিক্য কেন? বরযাত্রী হয়ে বিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন নাকি? তাঁর কথা শুনে আমাদের কারো মুখ থেকে কোনো রা বের হয় নি বরং আমরা রঙিন মানুষরা অধিকতর লজ্জাবোধ করছিলাম।

জেনারেল ওসমানী শুধু কঠোর নিয়মমানা সেনানায়কই ছিলেন না, ভেতরে ভেতরে অত্যন্ড় সরল, সজ্জন এবং আন্ড়রিকঋদ্ধ ব্যক্তিও ছিলেন। ভেবেচিন্ড়ে বাক্য ব্যয় করতেন। একদিন ঢাকার মিন্টুরোডে অবস্থিত তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। আমাকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি জানতেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি জানবাজি রেখে রণাঙ্গনের বহু ছবি তুলেছি। ব্রিগেডিয়ার ইফতেকার আহমদ রানা তখন সিলেটের কমান্ডিং অফিসার। প্রেস সেন্সরশিপ হিসেবে তিনি-ই ছিলেন এখানকার দায়িত্বে। আমি ছিলাম *পূর্বদেশ* পত্রিকার স্টাফ ফটোগ্রাফার। জেনারেল ওসমানী আমার ব্যাপারে সব জানতেন। তাঁর একজন বিশ্বস্ড় ব্যক্তি হিসেবে আমাকে তিনি আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতেন। হেসে বললেন, আমি কাউকে সার্টিফিকেট দিই না, কিন্ড়ু তোমাকে দিচ্ছি; না-দিয়ে পারলাম না। পরে তিনি একটি সার্টিফিকেট আমার হাতে প্রদান করেন এবং তাঁর বাসায় ডালভাত খাবারের আমন্ত্রণ জানান। নিম্নে আমার

ক্যামেরায় তোলা কিছু ফটো পত্রস্থ করা হলো। এ-ব্যাপারে আরেকটি কথা না-বললে নিজেকে বড় অকৃতজ্ঞ মনে হবে। এই স্মৃতিধর্মী বক্তব্যটি এবং ছবিগুলো হয়তো কোনদিন প্রকাশ পেতো না— যদি মদন মোহন কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল আমাকে তাগাদা এবং প্রেরণা না-দিতেন। অধ্যক্ষ লে. কর্নেল এম আতাউর রহমান পীরের কাছে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ।

Ministry of Defence

NOTIFICATION
No. 01/17/72 (NGO) 108-DEF/SECY-7th April. 1972 with a view to effectively participate in the proceedings of the constituent Assembly as an MCA, General M.A.G Osmani, psc M.C.A resigned his appointment as C-in-C. Bangladesh Forces and his resignation having been accepted by the president, he vacated the temporary appointment of C-in-C, Bangladesh Forces with effect form 7th April 1972 (forenoon). Accordingly he is reverted to the pension list from the same date.

Ministry of Defence
NOTIFICATION
No. 01/31-33/72-110 (3) DEF/SECY-7th April 1972 with the vacation of the appointment of temporary C-in-C. Bangladesh Forces the combined command of Bangladesh forces has been abolished with effect from 7th April 11972 (forenoon) and replaced by the three separate commands for the Bangladesh Army, Navy and Air Force with the following Acting Chiefs of Staff with immediate effect and until further orders.